

প্রকাশঃ ১৯৬০

প্রকাশক

বি. রায়

দেশকাল

৪ আমাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে

কোলাজ

২ জগদহরলাল নেহরু রোড

কলকাতা-৭০০ ০১৩

দুচীপত্র

মুখবন্ধ ,

মাক্স জাকব MAX JACOB

পাবী থেকে ভের্সাই ১৭ আমাব নিজস্ব কচির নয় এমন কবিতা ১৮
আকাশের রহস্য ১৯ উষা বা সন্ধ্যা ১৯ আমাব কাঠের জুতো ২০
সত্যিকাবেব ধ্বংসাবশেষ ২০ নেপল্‌সেব ভিত্তাবিগী ২১ সাহিত্যিক
বীতিনীতি ২১ মানব-প্রেম ২২ সাহিত্য আর কবিতা ২২ স্তব্ধ
অবণো ২৩ আমার ঘে কোন একটা দিন ২৩ যুদ্ধ ২৪ আমাদের
মক্ষ্মলেব বিষাক্ত জীবন ২৪

গীয়োম আপলিনের GUILLAUME APOLLINAIRE

লালচুল স্তন্যবী ২৫ ফটোগ্রাফি ২৭ অপবাজিতা ২৮ একটি কবিতা
২৯ ইসপাহান ৩০ যুদ্ধ ৩১ নিজের ওপর ৩২ আনার বাগানে ৩৩
বিজয় ৩৪ হাউই সংকেত ৩৮

ব্লেজ সঁদ্রার BLAISE CENDRARS

ট্রান্সাইবেবিয়ান আব ফ্রান্সের ছোট্ট জনেব গল্প ৩৯ আকাশ আর
সমুদ্রের চেয়ে তুমি সুন্দর ৫৮ চিঠি ৫৯ লেগা ৬০ আমি তো কথটা
বলেছিলাম ৬১ হাসা ৬১ ঘোপ ৬২ ফেন আমি লিখি ৬২

হেনরি মিশো HENRI MICHAUX

এক দুব দেশ থেকে আমি লিগছি ৬৩ পেশা ৬৮ আমার রাজা ৬৯
এম'মো'বা : রীতিনীতি ৭৪ গোবরা ৭৫ নোনে ও অলিয়াবেররা ৭৬
মহরতা ৭৭ সমুদ্র ৮৭ লাজাবাস, তুমি ঘুমিয়ে আছো ? ৮৬ স্থান,
মুহূর্ত, কালের উত্তরণ ৮৭

ফ্রান্সিস পোঁজ FRANCOIS PONGE

সিগারেট ৯১ কুটি ৯১ আশুন ৯২ প্রজাপতি ৯২ তিনটি দোকান ৯৩
বাক্পটুই ৯৪ উপবৃত্তাকার রেভিয়েটার ৯৫ বেডিঙ ৯৭ স্যুটকেস ৯৭

জাক প্রেভের JACQUES PREVERT

বার্ভাৰা ২২ ফুলওয়ালীৰ দোকানে ১০১ তোমার জন্তেও আমার প্রিয়া
১০২ উজান ১০৩ বেলায় ঘুম ভাঙলে ১০৩ শতক্ষেত্রে সম্মানক্ষেত্রে
১০৬ সংসারে ১০৯ দেশে ফেরা ১১৩ মাহুৰ ১১৫ আমেবিকাব
অভ্যন্তর ১১৬ পিকাসোর মাজিক লঠন ১১৮

রনে শার RENE CHAR

যজ্ঞা, বিক্ষোৰণ, নীরবতা ১২৫ বলা ১২৫ বাতাসকে বিদায় ১২৫
ওদের আবার দাঁও ১২৬ ছুটি ১২৬ চৌকাঠ ১২৭ এক ছুঁখে আমার
বাস ১২৭ উদ্ভাবকেরা ১২৮ কবিবা ১২৯ গ্রন্থাগারে আশুন ১৩০

লেওপল্ড সেদার সঁগর LEOPOLD SEDAR SENGHOR

সিন-এব ব্রাজি : ৩৫ কৃষ্ণা নারী : ৩৬ নবীন সূর্যের অভিবাদন : ৩৭

কবি পরিচিতি : ৩৮

বিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যেব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাল এবং
সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ১৬১

বিশ শতকের ফরাসি কবিতা : আটজন কবি

অনুবাদ : অরুণ মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য, নন্দদুলাল দে, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-
পাসনবিশ, নারায়ণ মৃধোপাধ্যায়, অপল দাসমহাপাত্র, সুদেষ্ণা
চক্রবর্তী, আলিস রায়চৌধুরী, মঞ্জু দাশগুপ্ত গোলক গুহ,
কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, পুষ্প দাশগুপ্ত ।

অনু কবন : শান্ত লাহড়ী :

প্রচ্ছদ : আপলিনের-এর কালি গ্রাম Pablo Picasso

মুখবন্ধ

বিশ শতকের কবাসি কবিতা

আজ আমরা যাকে ‘আধুনিক কবিতা’ বলে অভিহিত করি, তার ইতিহাস রচনা করতে গেলে একশ বছরেও বেশি পেছনে ফিরে তাকাতে হয়। কবাসি কবিতায় এই আধুনিকতার পূর্বভাস সূচিত হয়েছিল জেরার দ নেভাল এবং আলোয়াইজাস বেরুত্র-ব লেখায়। আর ১৮৫৭ সালে শার্ল বোদলেব-এব ‘লে স্যর দ্য মাল’-এর প্রকাশকে আধুনিক কবিতার জন্মলগ্ন বলে নির্দেশ করা যায়।

উনিশ শতকের কবাসি সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রতীকিবাদ। কিন্তু প্রতীকিবাদের মধ্যে লক্ষ্য কবা যায় বিভিন্ন প্রবণতাব বৈচিত্র্য। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয় মোবেআ-ব প্রতীকিবাদী ঘোষণাপত্র। কিন্তু প্রতীকিবাদী বলে চিহ্নিত সমস্ত কবিদের কাছে এই ঘোষণাপত্র কাব্যতত্ত্বের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। নিতান্ত সাধাবণভাবে ভাগ কবলেও দেখা যায়, এই কবিগোষ্ঠীর একদলের মধ্যে রয়েছে অবক্ষয়, বক্রোক্তি এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গির সঙ্গে একধরনের গীতিময় রোমান্টিকতার রেশ। আবেক-দলেব মনোভাবের সঙ্গে পার্নাসিয়ারদের সহমর্মিতা লক্ষ্য কবা যায়। তবে এঁদের সবাবই স্বীকৃত গুরু ছিলেন বোদলেব, ব্য্যবো, ভের্নে এবং মালার্মে। এবং এই সূত্র থেকেই এসেছে তাঁদের যাকিছু সহধর্মিতা।

উনিশ শতকীয় প্রতীকিবাদ বিবর্তিত পরিণতি লাভ কবে বিশ শতকের প্রথম প্রজন্মের কয়েকজন কবির সৃষ্টিতে—পল ভালেবিব সৃষ্ট মনন ও উপলব্ধির সমন্বয়ে রচিত কাব্যিক বিদ্যে—‘গুরু কবিতা’র আদর্শে, পল ক্লোদেল-এব গীতিময় গঞ্জে উচ্চাবিত মরমী কবিতায়, ফ্রান্সিস জাম-এর সরল, যুদ্ধ কণ্ঠে। মিলোজ-এব রহস্যময় মরমী কাব্যকে বা স্যা-জন পের্স-এব দৃকৃহ মহাকাব্যিক উচ্চাবণকে আমরা প্রতীকিবাদের সীমান্তে স্থাপন করতে পারি। প্রতীকিবাদের ধারা আজ পর্যন্ত রয়ে চলেছে। এট ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ এবং তরুণ কবি। প্রবীণদের মধ্যে পিয়েব জঁ-জুত, পিয়েব এমাহুয়েল, পাত্রিস দ লা তুর দ্য প্যা বা জঁ ক্লোদ রনার-এব ধর্মাত্মত্বময় মরমীয়া কবিতায়—জোএ বঙ্কে বা ইভ বনকোয়ার উপলব্ধির জগতে অধ্বষণে প্রতীকিবাদের সমৃদ্ধ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ-ওরদের অনেকের কবিতায়ও প্রতীকিবাদের উত্তরাধিকার পরিলক্ষিত হয়।

তবে এৰ পাশাপাশি, কবিতায় প্ৰথৰ বন্ধন থেকৈ মুক্ত হ'ব প্ৰয়াস ও সাক্ষ্য বিংশ শতকৰ কৰাসি কবিতায় আধুনিকতাৰ আবেকটি ধাৰা তৈৰি কৰেছে। সাধাৰণভাবে প্ৰতীকবাদী কবিতায় বাস্তবতাৰ বাহ্যিক ৰূপ পেরিয়ে তাৰ আন্তৰিক স্বৰূপেৰ সন্ধান, প্ৰাত্যহিকতাৰ মলিন দৈনন্দিন জীবন থেকৈ কবিতাকে বিচ্ছিন্ন ৰাখাৰ একটা প্ৰবণতা দেখা যায়। তাই উনিশ শতকৰ শেষেই জীবন-বিচ্ছিন্ন প্ৰতীকবাদেৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল, শোনা গিয়েছিল 'ঢ়েৰ হয়েচে, বোদলেৰ আৰ মালার্গেৰ ভক্ত হয়ে বহুকাল তো কাটল'। বিংশ শতকেৰ সূৰুতেই জুল বৰ্ম্যা-ৰ নেতৃত্বে 'মুনানিমিস্ম' আন্দোলন সূৰু হল—যাৰ উদ্দেশ্য হল 'একাত্ম এবং সমবেত জীবনেৰ' উপস্থাপনা।

ইতিমধ্যে আধুনিক জীবন এবং জগৎ সৰ্বব্যাপ্ত, অনস্বীকাৰ্য এবং নানা দিক থেকৈ আকৰ্ষণীয় হয়ে উঠেছে বাকল। চলচ্চিত্ৰ, গ্ৰামোফোন, বাহফেল টাণ্ডয়াব, প্যাবসেৰ ভূগৎ বেল, মোটৰ গাড়ি ইত্যাদি আৰো কত কি জীবনে নতুন বিশ্বায় আৰ সম্ভাবনা নিয়ে আসাছিল। বাস্তবেৰ এষ্ট নতুন জগৎ অনতি বিলম্বে কবিতায় প্ৰবেশাধিকাৰ পেল। ১৯০৯ সালে কবাসি পাইকা কগাবো-৩ বেকলো ইতালীয়ান কাব মাবনেত্তিৰ 'ভবিস্যদ্বাদী ধোষণাপত্ৰ', এই ধোষণায় যশ্ৰুগেৰ উপযুক্ত নতুন শিল্পকৃষ্টিৰ আহ্বান জানানো হোল। মাবি নোত্তৰ এই ধোষণাপত্ৰ কবাসি কবিদেবত নতুন যুগেৰ প্ৰযোজন সপক্ষে সচেতন কৰে তুলল। ১৯১৬ সালে আপলিনেব ভাব্যাদ্বেৰ সমৰ্থনে এক ধোষণাপত্ৰ প্ৰকাশ কৰেন। ইতিমধ্যে চিত্ৰকলাৰ 'ফুটিস্ম'ও বহুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখাব পথ দেখাল।

কবিতায় প্ৰদ্যমুক্তিৰ সন্ধানী কবিবা আধুনিক জগৎকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে চাহিলেন, আধুনিক জগতেৰ প্ৰশস্তি বচনা সূৰু হোল।

১৯১২ সালেৰ এপ্ৰিল মাসে ব্ৰেজ গদ্রাব লিপলেন 'ল্য ইয়ৰ্ক ইষ্টাব'। সেপ্টেম্বৰে গ্যেথাম আপলিনেব বন্ধুদেৰ পড়ে শোনালেন 'চিংকাব' নামে কবিতা। 'চিংকাব' কবিতাটি 'জোঁন' এই পৰিবৰ্তিত শিবোনাম নিয়ে ১৯১৩ সালে প্ৰকাশিত আপলিনেব-এৰ 'সুবাসাব' কাব্যগ্ৰন্থেৰ প্ৰথম কবিতা হিসেবে স্থান পেল। আধুনিক শহৰ—নিউ ইয়ৰ্ক কি প্যারিস—তাৰ জটিলতা, ভীড়, কৰ্মচাকল্য, অসংগতি সব কিছু নিয়ে সহাব এবং আপলিনেৰ-এৰ কবিতায় দেখা দিল। ১৯১৩ সালে প্ৰকাশিত হয় গদ্রাব-এৰ 'ট্ৰান্স-সাইবেরিয়ানেৰ গন্ত' নামক কবিতা। বোদলেৰ অথবা গ্যাবোৰ কল্পিত ভ্ৰমণেৰ পৰিবৰ্তে বাস্তব

ভ্রমণের বিবরণে এখানে কবিতা রচিত হয়েছে। সঁদ্রার এবং আপলিনের-এর কবিতায় বাইরের জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা, টেনে কি জাহাজে যাত্রা, সহরের বৈচিত্র্যময় পথে পথে হাঁটা, আইফেল টাওয়ার, ট্রাম-বাস, সৈনিক-জীবন প্রভৃতি সবকিছুই কবিতার বিষয় হয়ে উঠল।

বিশ শতকে ফরাসি কবিতার প্রণামুক্ত ধারার প্রবর্তক আপলিনের এবং সঁদ্রার। এঁদের সঙ্কে তৃতীয় ধার নাম যোগ করা যায় তিনি মাজ জাকব। ১৯১৭ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে তাঁর দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হলে জাকব নতুন কবিতার প্রথম সাবির উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য হন। তাঁর কবিতার প্রকাশ-পদ্ধতি পববর্তী স্যুরবেআলিস্ত রচনা বীতিব সূচনা ঘোষণা করে।

আপলিনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কবিতায় স্থান দেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল অনেকটা কোতুহলী এবং বিস্মিত বালকের। কিন্তু এই একই সময়ে যুদ্ধের ধ্বংসের পরিবেশে, শিল্প-সাহিত্যে ভাঙাব আন্দোলন ‘দাদা’-র সূচনা হয়। নতুনদের সমর্থক আপলিনের অবস্থা ‘দাদা’ আন্দোলন-কেও উৎসাহ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যাত্রীদের আশা, চিন্তা ও মূল্যবোধের জগতে যে আঘাত নিয়ে আসে সেট হতাশা মর্দীয়া অবস্থা থেকেই যেন ‘দাদা’-র বিদ্রোহ, সব কিছুকে অস্বীকার করার প্রবণতা। ‘দাদা’ আন্দোলন ছিল প্রধানত নেতিবাচক, যুক্তির পবম্পরাময় ভাষাসংস্থান তথা চিন্তাব বন্ধনকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই ছিল ‘দাদা’-র প্রয়াস : “মুক্তি : দাদা, দাদা, দাদা, কুঁকড়ে যাওয়া বঙালোর আত্মনাদ, বৈপরীত্য আর যতরকমের বিবোধ, বীভৎসতা, অপবিগামের জড়িয়ে যাওয়া : জীবন” (দ্বিত্ব জারা, ঘোষণাপত্র ১৯১৮)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পব সামাজিক-বাজনৈতিক জীবনে যখন কিছুটা স্থিতি দিবে এল, তখন ‘দাদা’ ব নাস্ত্যর্থক আন্দোলন একান্তভাবেই অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হয়ে পড়ল। এই সময়ের ‘দাদা’-আন্দোলনের শবিকদের বেশ কয়েকজন বেবিষে গিয়ে অস্ত্র ত্রৌ-র নেতৃত্বে স্যুরবেআলিস্ত আন্দোলন সুরু করেন। এই আন্দোলনের চবিত্র বিশেষভাবে অন্ত্যর্থক। ১৯২৪ সালের স্যুরবেআলিস্ত ঘোষণাপত্রে স্যুরবেআলিস্ত-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

স্যুরবেআলিস্ত : বি. পু., বিগুজ মানসিক ধ্বংসক্রিয়তা যাব দ্বারা প্রকাশ করা যায়, মৌখিক, লিখিত অপবা অগ্ন যেকোন উপায়ে চিন্তার যগার্প গতিপ্রকৃতি। যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত কোন প্রকাব নিয়ন্ত্রণ বিহীন, কোন প্রকার নৈতিক বা নন্দনতাত্ত্বিক অভিনিবেশে বাইরে, চিন্তার শ্রতলিপি।

স্মারবেআলিস্তরা চাইলেন ‘মানসিক স্বয়ংক্রিয়তার জগতে’ প্রবিষ্ট হতে ; উদ্ভাবিত হোল স্বয়ংক্রিয় রচনা-পদ্ধতি। ইতিমধ্যে বিশেষ দশকের শেষ দিক থেকে মার্কসবাদ ইয়োরোপময় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিপ্লবের ধাবণা স্মারবেআলিস্তদের আকৃষ্ট করে। ১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পটভূমিজটিল হয়ে উঠল। স্মারবেআলিস্তদের সামনে প্রবল দেখা দিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের। ব্রাতো সবরকম ‘নিয়ন্ত্রণ’-এর বিরোধিতায় অবিচল রইলেন। ফলে স্মারবেআলিস্ত গোষ্ঠীতে ভাঙন দেখা দিল। প্রথমে লুই আরাগ, পবে পল এলুয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্রাংকোপন্থী ক্যাসিস্টদের সঙ্গে গণতন্ত্রীদেব গৃহযুদ্ধ রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে ফ্রান্স তথা ইথোবোপেব বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে সচেতন কবে তুলল। এই সময়ে এলুয়াব নিগলেন, “সময় এসেছে যখন সমস্ত কবির অধিকার ও কণ্ঠব্য হোল একথা বলাবায়, তারা অন্য মানুষেব জীবনে, সমষ্টিগত জীবনে গভীরভাবে নিবিষ্ট।” ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু; ১৯৬০ সালে ফ্রান্স পরাজিত ও জার্মান অধিকৃত হয়। মার্শাল পেত্যা-ব নেতৃত্বে ভিষিতে জার্মান তাবদাব কবাসি সবকাব প্রতিষ্ঠিত হোল। প্রতিরোধেব আন্দোলনে যোগ দিলেন কবি সাহিত্যিকবা। ব্রাতো আমেবিকায় আশ্রয় নিলেন। ফলত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সময় স্মারবেআলিস্ত আন্দোলন গিতিযে পডল। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে ব্রাতো ফ্রান্সে ফিরে এসে আন্দোলনকে আবাব পুনরুজ্জীবিত কবাব চেষ্টা করেন, কিন্তু তা আর আগেব উদ্দীপনা ফিবে পায নি।

আন্দোলন হিসেবে স্মারবেআলিস্ত কবাসি শিল্প জগতে বিশ দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। এই আন্দোলন শিল্প সাহিত্যে এক নতুন মুক্তির আবহাওয়া তৈরি করেছিল, কবিতাব ক্ষেত্রে বিশেষ দশক এবং ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক হলো এই আন্দোলনেব সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়। আন্দোলনের আবহা থেকে অংশীদারদের মধ্যে পল এলুয়ার, লুই আরাগ, রবের দেসুনসু এবং অঁদ্রেব্রাতো কবি হিসেবে প্রথম সাবিতে পডেন। কিছুকাল এই আন্দোলনে জড়িত থেকে পরবর্তীকালে বোরয়ে আসেন জাক প্রোভের এবং রনে শার। আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও কবি-চরিত্রের বিচারে এই আন্দোলনেব পাশাপাশি রাখা যায় জঁ ককতো, পিয়ের রভেদি এবং জুল স্যুপেরভিয়েলকে। স্মারবেআলিস্ত আন্দোলন পরবর্তীকালের কবাসি সাহিত্যকে

বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছে। প্রথা-নির্দিষ্ট কব্ব অথবা ভাবারীতির বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ফরাসি সাহিত্যজগতের ঐতিহ্যের অধিকারে পরিণত হয়েছে।

চল্লিশের দশকে ফরাসি সাহিত্য তথা কবিতার নতুন অভিজ্ঞতা জাৰ্শান অধিকারের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ অর্থে জাতীয়তাবাদী বা বৃহদর্থে মানবতাবাদী, প্রতিরোধের সাহিত্য। প্রতিরোধের বাস্তব সংগ্রাম কবিতাকে গণজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে শব্দ মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত করল। এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারও স্বভাবত পরবর্তী ফরাসি কবিতার শরীরে সঞ্চারিত হয়েছে।

সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি গোষ্ঠীব বাইরে স্বতন্ত্রভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবি রয়েছেন যাদের সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে বিশ শতকের ফরাসী কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা তাঁদের কবিতা অন্ততব নতুন অভিজ্ঞতাব সন্ধান। এবকম কবি হিসেবে প্রথমেই নাম কবতে হয় অঁরি মিশো, ফ্রঁসিস পোজ একং যোজেন গিলভিক-এর। মিশোর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ভিত্তিক দৃষ্টিতে দেখা জগতের বিবোধ এবং বৈপরীত্য। পোজ এবং গিলভিকে কবিতার প্রধান অবলম্বন বস্তুজগৎ।

যুদ্ধপরবর্তীকালের ফরাসি কবিতার বৈচিত্র্যসৃষ্টিকারী ঘটনা ইসিদোর ইস্ত্রব প্রবর্তনায় লেত্রিস্ত আন্দোলন। শুধু বাক্যসংস্থান নয়, শব্দকে পর্যন্ত ভেঙে চূবে লেত্রিস্তরা যা করতে চেয়েছেন তা দাদাবাদীর শৃঙ্খলিত ভাঙাচোবাকেই স্ববণ করিয়ে দেয়।

বিশ শতকে ফরাসি কবিতাব এক নতুন দিগন্ত ফরাসিভাষী অফরাসিদের কবিতা। এর মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের কবিতা। বিশ শতকের ফরাসি কবিতার আধুনিকতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছে কৃষ্ণাঙ্গদের ঐতিহ্য এবং উপলব্ধি, যাকে বলা হয় 'নেগ্রিচ্যুদ'। বিশ শতকের প্রথম সারির ফরাসি ভাষার কবিদের নাম করতে গেলে সেনেগালের কবি লেওপল্ড সেদার সঁগর এবং মার্তিনিকের কবি এমে সেজেবের নাম অবশ্যই করতে হয়।

একজন কবির কাব্যরচনার দুটো দিক থাকে—একদিকে কাব্যঐতিহ্যব উত্তরাধিকার আর অন্যদিকে ব্যক্তি-চরিত্র এবং উচ্চারণভঙ্গি। বিশ শতকের তরুণতর ফরাসি কবি, অর্থাৎ ধারা পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তরের দশকে লিখতে শুরু করেছেন এবং লিখেছেন, তাঁদের কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই

বলা দরকার যে দাদা বা স্যুররেআলিস্ম-এর মত কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সাম্প্রতিক করাসি কবিতায় অনুপস্থিত ; বিশেষ বিশেষ পত্রিকাকে ঘিরে কবি-গোষ্ঠী থাকলেও যথার্থ কোন আন্দোলনের নামে কবিদের চিহ্নিত করা যায় না। এঁদের কাব্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে প্রতীকিবাদের বিশ শতকের ঐতিহ্য, স্যুররেআলিস্ম এবং গোষ্ঠী পবিচয়হীন স্বাভাব্যচিহ্নিত কবিদের অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু, বর্তমান সংকলনে আমরা তরুণতর কবিদের উপস্থাপিত করছি না বলে তাঁদের ব্যক্তি-চরিত্র এবং উচ্চারণভঙ্গির আলোচনায় প্রবেশ করছি না।

বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে

বর্তমান সংকলনে আমরা বিশ শতকের আটজন ফরাসি ভাষার কবি কবিতা বাংলা অনুবাদে উপস্থাপিত করছি। কবিদের মধ্যে মাক্স জাকব, জাক প্রেভেব, রনে শাব, ঝঁবি মিশো এবং ফ্রঁসিস পৌজ-এর কবিতা আমাদের দ্বিভাষিক (বাংলা-ফরাসি) সাহিত্য সংকলন স্ফুর্ষস (পূর্ববর্তী নাম ২৪)-এ প্রকাশিত অনুবাদ থেকে নিবাচিত। ব্রেজ সত্রাব, গায়োম আপলিনের ও লেওপল্ড সেদাব সঁগর-এর কবিতাব অনুবাদ নতুন কবে যোগ করা হয়েছে। আপলিনের-এর কবিতাব অনুবাদ ‘লালচুল সুলদবী’ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত ‘সপ্ত সিন্ধু দশ দিশন্ত’ নামে অনুবাদ-কবিতার সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপস্থাপিত কবিদের প্রত্যেকের বেশ কিছু কবিতা দেওয়া হয়েছে, যাতে উক্ত কবিদের বৈচিত্র্যের একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে বিশ শতকের ফরাসি কবিতাব একটা সাধারণ পরিচয় লাভ করা যায়। বিশ শতকের ফরাসি কবিতাব অনুবাদের একটা পূর্ণতর সংকলন ভবিষ্যতে প্রকাশ করা হবে আমাদের কাছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অতি সাম্প্রতিক কবিদের বাদ দিলে বিশ শতকের কবিদের অনেকে বিক্ষিপ্ত অঃবাদ বা আলোচনার মাধ্যমে এদেশে অল্পবিস্তর পরিচিত।

পরিশেষে অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। যে কোন অনুবাদে সাধারণত দু ধরনের বাধা সম্মুখীন হতে হয়—প্রথমত ভাবাত্মিক, দ্বিতীয়ত সাংস্কৃতিক। শব্দের রূপ ও বিগ্রাস, বাক্যের গঠন, ক্রিয়ার ভাব ও কাল, বিভিন্ন ধরনের অব্যয়ের ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষার নির্দিষ্ট

রীতিপদ্ধতি আছে। এই রীতিপদ্ধতির বিশেষ কিছু প্রবণতাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে বিশেষ যুগ এবং বিশেষ লেখকের রচনামৈলী। অল্প কোন ভাষায় তার রূপ ও গঠনের প্রতিক্রিয়া নির্মাণ এই ভাষার নিজস্ব কাঠামোর জন্ত অসম্ভব। অমুবাদে যা করা হয় তা হোল মূল রচনার অর্ধগত উপাদান বা বক্তব্যকে অল্প এক ভাষার কাঠামোর প্রকাশ করা, এই ভাষায় একটা অমুরূপ নির্মাণের চেষ্টা। অমুবাদের সাংস্কৃতিক সমস্তা বলতে বোঝায় বিশেষ শব্দ, পদসমষ্টি বা বাক্যগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক উপাদান—যা অল্পভাষার প্রতিশব্দের রূপান্তরে লুপ্ত হয়ে যায়। কবিতায় যেহেতু ভাবানবীর্ষই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কবিতার ভাষান্তর তাই দুর্লভতম সংগ্রাম।

তবু সাহিত্য তথা কবিতার ভাষান্তর হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। যে কোন সাহিত্যপ্রায়গীকে বিশ্বসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আশ্রয় করে নিয়ে অমুবাদের মাধ্যমে। বাংলাভাষায় শতাব্দিক বড় বড় ধরে করাসি সাহিত্যের অমুবাদ হয়ে আসছে। তবে সে অমুবাদের অনিকাংশই ইংরেজি অমুবাদের ভাষান্তর, অর্থাৎ তা রূপান্তরের রূপান্তর। এ জাতীয় অমুবাদের অনেক একটি নির্দেশ কবা গেলেও বলতে হয়, এ ধরনের অমুবাদ অল্পবিস্তর পৃথিবীর সব সাহিত্যেই অনিব্যাহারে হয়ে থাকে। বর্তমান সংকলনের অমুবাদগুলি কবাসি থেকে কবা। তবে সরাসরি ভাষান্তর যে সবসময় উৎকৃষ্ট হবে এমন কথা বলা যায় না। কেননা, যে ভাষায় অমুবাদ করা হচ্ছে অমুবাদের সেই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলে ভাষান্তর অক্ষম প্রতিশব্দবিহীন পথবিস্তৃত হয়। বিশেষভাবে একথা মনে রেপেই আমরা অমুবাদ নিবাচন করতে চেষ্টা করেছি; অমুবাদের সাহিত্যমূল্যের কথা আমরা ভুলি নি।

এছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজি নয় এমন বিদেশী সাহিত্যের ইংরেজি অমুবাদ পড়তে অভ্যস্ত বা পড়া শ্রেয় বলে বিবেচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের ধারণা, একটা বিদেশী ভাষার সাহিত্য অল্প একটা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পড়াটা বেশ কিছুটা দুরপথে লক্ষ্যস্থলে পৌছানোর চেষ্টার সামিল, আর মাঝপানের দ্বিতীয় বিদেশী ভাষা পথ ও লক্ষ্যের মধ্যে একটা বাড়তি প্রাচীর তুলে রাখে। সেই প্রাচীরের বাধা দূর করার কাজে অংশীদার হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের এই সংকলন।



মাক্স জাকবের কবিতা
POEMES DE MAX JACOB

পারী থেকে ভের্গাই

পারী থেকে ভের্গাই
শান-বাখানো সড়ক পর পর
পচিশটা দল করে সাকাই
টহল দিয়ে সারাটা রাতভর ।

ভেড়ার পালের আগে আগে
লোহার টুপি থাকেই থাকে রোজ
“প্রভু তোমার উৎসবের জন্তে লাগে
এসব এবং তোমাব বাড়ির ভোজ ।”

জানলা থেকে মিটমিটিয়ে
বেড়াল ওদের দেখে কাতার কাতার
জন্তদের ছালচামড়া দিয়ে
তৈরী হবে কিতে জুতোর জামার :

খামতে হয় চুন্ধিখানার
আটুকোণা এই মাছিগুলোকে ছাড়ে
এগুলো চাই রাজার বিছানার
মুখের জন্তে ভেড়ার ঠ্যাঙ হাড়ও
এবং পশম শোয়ার জন্তে আরও
উকুন এবং মশা
চাকরদের জন্তে তাদের হিসেব আছে কবা ।

অক্ষয় খিড়

হলি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক শহর। তার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ডন জুয়ান, রথশিল্পী, ফাউন্ট ও এক শিল্পী।

রথশিল্পী বলল—আমি বিপুল সম্পদ জমা করেছি, কিন্তু তার থেকে কোনো আনন্দ পাই না বলে আরো টাকার পেছনে ছুটে চলেছি। আশা ছিল, প্রথম এক কোটি টাকা যে আনন্দ দিয়েছিল, আবার তা ফিরে পাব।

ডন জুয়ান বলল—আমি দুঃখের মধোও ক্রমাগত প্রেমের সন্ধান করে চলেছি। নিজের ভালবাসতে না পেলেও অন্তরে ভালবাসা পাওয়ার মত যত্ন নেই। তবু আমি প্রেমের সন্ধান করে চলেছি, প্রথম প্রেমের উন্মাদনা কিবে পাবার আশায়।

শিল্পী বলল—আমি এক গোপন বহস্ত্র আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছিলাম। তারপর আমি নিজের চিন্তাকে সচল রাপতে আরো গোপন বহস্ত্র অনুসন্ধান করেছিলাম। কিন্তু তার ফলে ধ্বংস হয়েছিল আমার প্রথম আবিষ্কারের কসল, আমার প্যাতি, প্রতিষ্ঠা। বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও আমি কিবে যাচ্ছি আমার পুরনো ছকে।

ফাউন্ট বলল—আমি স্নুপের জগৎ বিজ্ঞান ছেড়েছিলাম, কিন্তু আমি বিজ্ঞানে ফিরে যাচ্ছি, যদিও আমার কাজের পদ্ধতি আজকাল পুরনো, অচল। কেননা অনুসন্ধান ছাড়া আর কোনো স্নুথ নেই।

তাদের পাশে ছিল নকল আইভির মুকুট-পর্য্য এক তরুণী। সে বলল—সবকিছু আমার একঘেয়ে লাগে। আমি বড় বেশী সুন্দরী।

আর হলি গাছের পেছন থেকে ঈশ্বর বললেন—আমি বিশ্বকে চিনি। সব আমার একঘেয়ে লাগে।

নৃত্যোৎসব থেকে কিরে আমি জানলার বসে আকাশটাকে দেখলাম—
দেখে মনে হল, মেঘগুলো যেন খাওয়ার টেবিলে বসে বুড়োদের বিশাল বিশাল
মাথা—তাদের সামনে কেউ যেন পালক দিয়ে সাজানো সাদা একটা পাখি
এনে দিচ্ছে। আকাশ পবিত্রতা করে একটা মস্ত বড় নদী হয়ে চলেছে।
বুড়োদের মধ্যে একজন মাথা নিচু করে আমাকে দেখছিল—এমনকি আমার
সঙ্গে কথা বলতে বাচ্ছিল, হঠাৎ এই সময় জাহ্নু কেটে গেল—আকাশে রইল
শুধু ঝলমলে তারাগুলো।

দুশেখা চক্রবর্তী

উষা বা সন্ধ্যা

ধব্ধবে সাদা গল্পজের কণ্ঠ থেকে আলো আসছে, সামনে থেকে আলো
আসছে, আলোর সামনে দিয়ে সিঁড়িটা নেমেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। না!
ওটা দেখা যাবে না। শুধুমাত্র একটা ধাপে দাঁড়াবার জায়গায় আমার পিঠটা
দেখা যাবে। যে দেওয়ালগুলো এখনো রাতের মধ্যে সেগুলোকে দেখা যাবে না,
শুধু সেইসব লোকগুলোকে দেখা যাবে যারা এখনও খোপের ভেতর। প্রথমজন
অন্ধকারের পোশাক পরা; রাত্রি ওর পোশাক; দ্বিতীয় জনকে দেখিনি,
অনেকটা আন্দাজ করেছি; তৃতীয় জন নেমে এসেছিলো, সে আমার কাছ পর্বন্ত
এলো; বাকিরা কেউ নড়েনি। যে নেমেছিল তার চৌথুপি কাটা প্যান্ট, তার
ভুরুতে চুল আর তার চুলগুলো কালো, সে আমার হাতটা তার গালে ঘেঁষে-
ছিলো কারণ তার গালের রঙ ছিলো পাকা কলের রঙ; তার হাবভাব
তুচ্ছ মানুষের এবং সে তার খোপের মধ্যে উঠে গেল। ধব্ধবে সাদা গল্পজের
কণ্ঠ থেকে আলো আসছে, আমার সামনে, আমার সামনে। এবং বুঝতে
পারলাম যে, এই লোকগুলো ছিলো আমার ভবিষ্যৎ বইয়ের চরিত্র।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আমার কাঠের জুতো

আমার কাঠের জুতো, আমার কাঠের জুতো
কোথায় ফেলে এসেছি আমার কাঠের জুতো ?

সিঁড়ির তলায়
সার্ডিনের সিঁড়ি
মাঝখানে ডেকের সিঁড়ি

—আমার কাঠের জুতো, আমার কাঠের জুতো
কোথায় ফেলে এসেছি আমার কাঠের জুতো ?

—কবরখানার দরজায়
তোমাকে যেদিন কবর দেওয়া হয়েছিল ।
—হা ঈশ্বর ! কি দুঃখের কথা ।
আমি যে শপথ করেছিলাম
স্বর্গে অথবা নরকে মাটি নিয়ে যাব না ।
সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছি ।

সুদেষ্কা চক্রবর্তী-খাসনাবন্দ

সত্যিকারের প্রেমসাব্যবস্থা

যখন আমার বয়স অল্প ছিল, আমি বিশ্বাস করতাম যে অশরীরীরা এবং পরীর সর্বদা আমাকে পরিচালনা করবার জন্ত সচেষ্ট থাকত । আমাকে খখন কেউ কোন আঘাত দিত, তখনও আমি ভাবতাম যে এটা একে অজ্ঞের সঙ্গে আমার এবং শুধু আমারই মঙ্গল চিন্তা করে কথাবার্তা বলছে । বাস্তবের আঘাত এবং দুঃখকষ্ট আমাকে এই জারগান্ধ গায়ক করে তুলেছে, আমাকে শিখিয়েছে যে দেবতারা চিরকালই আমাকে পরিত্যাগ করে এনেছে । হে অশরীরী, হে পরীর দল ! আমাকে আবার সেই আগেকার কল্পনা-বিলাস কিরিয়ে দাও ।

সুদেষ্কা চক্রবর্তী

নেপল্‌সের ডিথারিণী

আমি যখন নেপল্‌সে ছিলাম, আমার প্রাসাদের দ্বারে একটি ডিথারিণী থাকত। গাড়িতে ওঠার আগে আমি তাকে কিছু পরস ছুঁড়ে দিতাম। কোন-দিন কোন খন্তবাদ না পেয়ে অবাক হয়ে একদিন সেই ডিথারিণীর দিকে তাকিলাম। দেখলাম, যাকে আমি ডিথারিণী বলে ভাবতাম আসলে সে একটি সবুজ রঙের কাঠের বাস্ক—যার মধ্যে ভরা লাল রঙের মাটি আর কিছু আধপচা কলা...

বুদ্ধের চক্রবর্তী

সাহিত্যিক রীতিনীতি

একদল ভক্তলোকের সঙ্গে যখন আরেকদল ভক্তলোকেব দেখা হয়, অভি-বাদনের সঙ্গে যুদ্ধ হাসি মিশে না যাওয়াটা দুর্লভ। যখন একদল ভক্তলোকের সঙ্গে একজন ভক্তলোকের দেখা হয়, তখন অভিবাদন বেশ আনন্দজনক হলে অভিবাদন করতে থাকে আর কখনো কখনো দলের শ্রেয়জন অভিবাদন করে না। মনে হয়, আমি লিখেছি যে তুই একটি মেয়েছিলেন স্তনের বোটার কামড়ে দিয়েছিল। আর স্তন থেকে রক্ত পড়েছিল। তুই যদি বিশ্বাস করিস এ ব্যাপাবটা আমি করেছি তাহলে তুই আমাকে অভিবাদন করিস কেন? আর আমি যদি ভাবতাম তুই কাজটা করেছিস তাহলে আমি তোকে অভি-বাদন করতাম কি? চলমা-পর্য মোটা এক মহিলা যার হাতে-বোনা একটি আলখাল্লা আছে, তার বাড়িতে আমাদের দেখা হোল, তুই আমার করমর্দন করলি, তবে যে ঘরে মহিলার হেঁড়া চেয়ার ছিল সে ঘরটাতে আমবা ছিলাম, আর তুই আমার মাথার হেঁড়া চেয়ারের তাকিয়া ছুঁড়ে মারলি। তাকিয়াগুলি ছিল নিতান্ত অষ্টাদশ শতকের। লোকে বলে, নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার পরিবর্তে আমি তোকে তাকিয়া ছুঁড়ে মেরেছি। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না। যখন আমার দলের সঙ্গে তোর দেখা হবে তখন যে অভি-বাদন করে না সেই শেষের জন যদি আমি হই, ভাবিস না ওটা তাকিয়ার ঘটনার জন্ত। কিন্তু আমার দলের সঙ্গে যদি তোর দলের দেখা হয়, আর তাতে যদি যুদ্ধ হাসি বিনিময় হয় ভাবিস না তার মধ্যে আমার হাসিও আছে।

পুঙ্খ দাপণ্ড

কেউ কি কোলাব্যাঙকে রাস্তা পার হতে দেখেছে? এ এক কুহে মাহুয : কোনো পুতুলও এর চেয়ে ছোট্ট নয়। মাহুযটা হাঁটু ঘষটে চলেছে : লোকে বলবে সে লজ্জিত...? না, সে বেতো ধগী। একটা পা পেছনে থেকে যায়, সেটাকে আবার সামনে নিয়ে আসে। এভাবে সে যাচ্ছে কোথায়? সে বেরোল নর্দমা থেকে, হতচ্ছাড়া সড়। বাস্তাব ঐ কোলাব্যাঙকে কেউ নজর করেনি। আগে কেউ আমাকে রাস্তায় নজর করত না, এখন বাচ্চারা আমার হুল্লে তারা দেখে ভ্রামাসা করে। ভাগ্যান কোলাব্যাঙ, তোমার হুল্লে তারা নেই।

অক্ষয় মিত্র

সাহিত্য আর কবিতা

লোরিয়র কাছাকাছি, ঝলমলে বোদ আর আমবা বেড়াচ্ছিলাম, দেখ-ছিলাম সেপ্টেম্বের এই দিনগুলিতে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে বন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাড়া পাহাড়গুলি ডুবিয়ে দিচ্ছে। শীত্ৰই গাছের তলায় সরু পথের ঝাঁকগুলো ছাড়া আর কিছুই সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করার জগ্ন বইল না। আর পবিবাবগুলি সব পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল। আমাদের মধ্যে নাবিকের পোশাক-পবা একটা বাচ্চা ছিল। ও বিবগ্ন হয়েছিল। হাত ধরে সে আমায় বলল, বুঝলেন, আমি নেপল্‌সে ছিলাম। জানেন তো নেপল্‌সে এস্তার গলি আছে, রাস্তায় একা একা কাটানো যায়, কেউ আপনাকে দেখবে না, নেপল্‌সে লোকজন যে বেশি নেই তা নয়, তবে এত রাস্তা আছে যে জনপ্রতি কখনই শুধু একটা রাস্তা পড়ে না। —বাবা বললেন, ছেলোটা আপনাকে যত বাজে কথা বলে যাচ্ছে, নেপল্‌সে ও যায় নি। —বুঝলেন মশায়, আপনার ছেলে কবি। —ভালোই, তবে ও যদি সাহিত্যিক হয় তাহলে আমি ওর ঘাড় ভেঙে দেবো। —সমুদ্র সরু পথের ঝাঁকগুলোকে শুকনো রেখে দিয়েছিল, সেগুলি তাকে নেপল্‌সের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

পুঙ্খ দাশগুপ্ত

কল্প অরণ্যে এখনও রাজি আসে নি—দুঃখের ঝড় এসে এখনও বিক্ষুব্ধ করে তোলে নি গাছের পাতাগুলোকে। কল্প অরণ্য থেকে বনদেবীরা পালিয়ে গেছে—তারা আর এখানে ফিরবে না।

কল্প অরণ্যে ছোটনদীর কোন ডেউ নেই, কেননা এখানে পাহাড়ী নদী প্রায় জল ছাড়াই বাক নিয়ে বয়ে যায়।

কল্প অরণ্যে একটি গাছ আছে—অন্ধকারের মতন তার কালো রঙ—গাছের পেছনে মাহুকের মাথার চেহারার একটি ঝোপ সেই ঝোপে আশ্রয় লেগেছে—বক্ত আর সোনার আশ্রয়ে সেই ঝোপটি জলছে।

কল্প অরণ্যে—যেখানে বনদেবীরা আর ফিরবে না—আড়ে শুধু তিনটি কালো ঘোড়া—এই তিনটি কালো ঘোড়ায চড়ে এক সময় তিন মেজাই রাজা তীর্থযাত্রায় এসেছিলেন। রাজারা আর ঘোড়াব পিঠে নেই—কোথাও নেই—ঘোড়ারা মাহুকের মতন কথা বলে।

মৃণাল চক্রবর্তী

আমার যে কোন একটা দিন

দুটো নীল পাত্রে পাম্পের জল ভবে নিতে চেয়ে, মটরের উচ্চতার জন্ত মাথা ঘুরে গিয়ে; আমার একটা বাড়তি পাত্র থাকায় ফিরে এসে এবং মাথা ঘুরতে থাকায় পাম্পে ফিরে না গিয়ে, আমার প্রদীপ থেকে তেল চু ইয়ে পড়ে তাই একটা বড় রেকাব কিনতে বাইরে গিয়ে; প্রদীপের অল্পপযোগী, চায়ের সরঞ্জামের চৌকো রেকাব ছাড়া অন্য কোন রেকাব খুঁজে না পেয়ে এবং রেকাব ছাড়াই বেড়িয়ে এসে। সাধারণ গ্রন্থাগারের দিকে হেঁটে ৬ আমার ছুটো নকল কলার পরা রয়েছে এবং কোন নেকটাই নেই পথে তা নজরে এসে; বাড়ি ফিরে ভিলট্রাক মশারের কাছে একটা পত্রিকা চাইতে তাঁর বাড়ী গিয়ে এবং পত্রিকাটিতে জ্যুল রম্যা মশায় আমার নিন্দা করেছেন বলে পত্রিকাটি না নিয়ে। অহুশোচনার না বুঝিয়ে, অহুশোচনা আর হতাশায়।

অশিস বায়টোরুদী

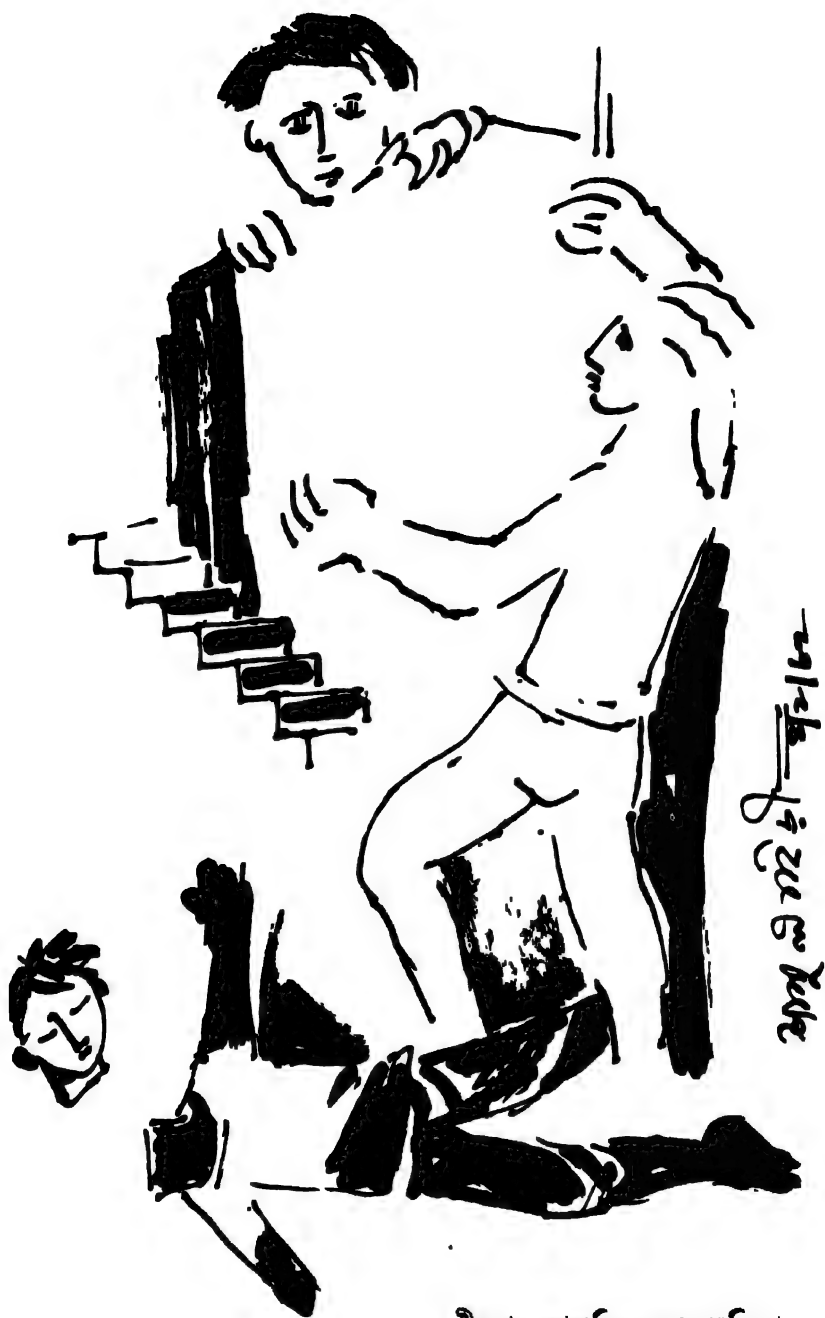
রাতে বাইরের রাস্তাগুলো তুমারে ভর্তি ; ডাকাত হোল সৈন্তরা ; হো হো হাসি আর তলোয়ার দিয়ে আমার আক্রমণ করা হয়, আমার পোশাক আশাক সব খুলে নেওয়া হয় : কের আরেকটা চৌকোশার পড়ে বাওয়ার জন্ত আমি ছুটে পালাই। এটা কি কোন সৈন্যদের ছাউনির উঠোন না কি সরাইখানার উঠোন ? কত তলোয়ার ! কত বল্লমধারী ! তুমার পড়ছে। আমাকে ইঞ্জেকসনের ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হোল : আমার মারার জন্ত একটা বিষ ; ক্রেপে ঢাকা কবালের মাথা আমার আঙুল কামড়ে ধরে। পথের অশুট আলো তুমারের ওপর আমার মৃত্যুর আলো ফেলে।

গুরু দাশগুপ্ত

আমাদের মকবুলের বিবাক্ত জীবন

তোমার গ্রন্থগুলো মুছে ফেলার রবার।
তোমার স্বপ্নগুলো মুছে ফেলার রবার।
তোমার শিকারীদের পথগুলো মুছে ফেলার রবার।
তোমার বলিরেখাগুলো মুছে ফেলার রবার।
আমাদের ব্যথার কুস্তলের মুখোস।

আশিস রায়চৌধুরী



গীয়োম আপলিনের কবিতা
 POEMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE

গীয়োম আগলিনের

লালহুল বুলবী

সকলের সামনে এই আমি কাণ্ডজ্ঞান আছে যার এমন মাহুয
জীবন যে জানে আর মৃত্যুর যা জানা যার তাও জানে
অমৃত্যব করেছে যে যজ্ঞা ও প্রেমের পুলক
মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে নিজের ভাবনা
কয়েকটা ভাষা যাব জানা

দেশ মন্দ দেখেনি যে
গোলন্দাজ পদাতিক বাহিনীতে যুদ্ধও কবেছে
মাথায় জখম হয়ে ক্লোরকর্মের পব কাটাচ্ছে কবিয়েছে
ভয়ংকর লড়াইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের হাবিয়েছে
পুরনো এবং নতুনের যতগানি জানা যার আমি জানি
আজ আমাদের মধ্যে আর আমাদের জন্তে যুদ্ধ এই
এ নিয়ে ব্যগ্র না হয়ে আমি হে বন্ধুবা
ঐতিহ্য এবং আবিষ্কার শৃঙ্খলা দুর্গম খোঁজা এই দীর্ঘ
বিবাদের বিচার সহজে করি

ঈশ্বরের মুখের ছাঁদে তোমাদের মুখ গড়া
যে মুখ শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু নয়
তোমরা আজ আমাদের আব যত শৃঙ্খলার অবতারদের
তুলনা যখন করো আমাদের কমাঘেঁষা কবে নিঙ
আমরা যারা সর্বত্রই দুর্গমকে খুঁজি
তোমাদের শত্রু আমরা নই
আমরা চাই নিজেদের দিতে এক বিশাল আশ্চর্য রাজ্য
পুষ্পে পুষ্পে যেখানে রহস্য কোটে যার ইচ্ছে করবে সে চয়ন
যেখানে নতুন আলো যার বড় কখনো দেখেনি
হাজার অচিন্ত্য ছায়াচর

তাদের বাস্তবে আনতে হবে

নিভা আমরা হৃদয় সন্ধান করি সে এক বিরাট দেশ

যেখানে নীবব সব কিছু

এবং সময় যাকে বিভাভিত করা চলে কিরিয়েও আনা যায়

আমাদের নিশ্চয় করুণা কোবো আমরা যারা সবদাই

লড়ে চান ভবিষ্যৎ আর সীমাহীন এ দুয়ের সীমানা

আমাদের ভুলভ্রান্তি আমাদের পাপ করুণার চোখে দেখো

এই তো এসেছে গ্রীষ্ম রক্ত ঋতু

আমাব যৌবন মৃত যেমন বসন্ত মৃত আজ

হে সূর্য এ এক গাঢ় প্রদীপ

যুক্তিব অন্ধকার

আমার প্রতিজ্ঞা থাকে

অতুগামী হব বলে যতক্ষণ না সম্মুখে স্পষ্টত

সে হবে অপূর্ব কাব্য আমি ভালোবাসি শুধু তাকে

সে আসে আমাকে টানে যেন টানে চুষক লোহাকে

তার রূপ মনোহর লাগে

লালচুল পুন্দরীণ মতো

সোনার কুন্তল তার বলা চলে

যেন চিবস্তন বিদ্রোহের প্রভা নভস্তলে

কিবা যেন আগুনের শিখা ঝলকিত

শুকনো কাঠ গোলাপের পাপড়িতে বিধ্বত

আমাকে দেখিয়ে হাসো হাসো

পৃথিবীর যত লোক বিশেষত এখানকার যারা

কাবণ কত যে বসন্ত রয়েছে যা আমাদের বলতে ভয় পাই

এত সব বসন্ত তোমরা যা আমাকে বলতেই দেবে না

তোমরা কোরো আমাকে করুণা

অরুণ মিত্র

কটোগ্রাফি

তোমাব হাসিটি আমাকে টানে যেমন

একটি ফুল আমার টানতে পারতো

কটোগ্রাফি তুমি বাদামী ব্যাণ্ডের ছাতা

বনের

সুন্দর

গুহ্রতা সেখানে

জ্যোৎস্না

একটি শাস্ত বাগানের মধ্যে

জীবন্ত জলধারা আর শয়তান মালীতে পূর্ণ

কটোগ্রাফি তুমি তাঁর উত্তাপের ধোঁয়া

সুন্দর

আর তোমাব মধ্যে

কটোগ্রাফি

সব অবসন্ন সুব

সেখানে লোকে শোনে

একঘেয়ে গান

কটোগ্রাফি তুমি ছায়া

স্বর্ধের

সুন্দর

মহুশ দাশগুপ্ত

অপরাজিতা

কুড়ি বছরের
যুবক
এমন ভয়ংকর সব কাণ্ডকারখানা তুমি দেখেছো
তোমাব শৈশবের মাহুযগুলোর সম্বন্ধে তোমাব ধারণাটা কি
তুমি
তুমি
একশ
বাবেরও
বেশি
মুগো
মুগি
মৃত্যুকে
দেখেছো
তুমি
জানো
তোমার দুঃসাহস সঞ্চালিত করো
না
জীবনটা
তোমার পবে যাবা আসবে
কি
জি
তাদের মধ্যে
নি
স

তরুণ যুবা
তুমি উৎফুল্ল তোমার স্মৃতি রক্তাক্ত
তোমার অন্তরও লাল
আনন্দে
তোমার কাছাকাছি যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের প্রাণশক্তি
তুমি নিজের ভেতর টেনে নিয়েছ

তোমার মধ্যে আছে সংকল্পের দৃঢ়তা
এখন বিকেল পাচটা আর তুমি মরতে
জানবে

নিদেনপক্ষে তোমার অগ্রজদের চেয়ে ভালোভাবে
অস্তিত্ব আরো নিষ্ঠা নিয়ে
কেমনা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে
তুমি বেশি পরিচিত
হে বিগত দিনের মাধুর্য
স্ববর্ণাভীত মন্ববতা

গুরুদাস গুপ্ত

একটি কবিতা

সে ঢুকল
সে বসল
লাল ছুল শিলীভূতের দিকে সে তাকাল না
দেশলাই-এর কাঠি দপ্ করে অলে ওঠে
সে চলে গেছে

১৯১৩

গুরুদাস গুপ্ত

ইস্পাহান

তোমার গোলাপের জন্ত
আরো বহু দীর্ঘ পথ
আমি পার হতাম

তোমার স্মৃতি সেই স্মৃতি নয়
যে আর সব জায়গায়
আলো দেয়
আর তোমাব গানগুলি যা উষ্মার সঙ্গে খাপ খায়
এর পব থেকে সেগুলি আমার
শিল্পের পরিমাপ
ওদের স্মৃতির অঙ্গসরণে
আমি বিচার করব
আমার কবিতা চাক
কলা আব তোমাকে
প্রিয় মুখ

ভারের সঙ্গীতময় ইস্পাহান
তাব বাগানের গোলাপেব সৌরভের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়
আমার অস্তবকে স্মৃতিভিত্তি কবে নিয়েছি
গোলাপের গন্ধে
চিরজীবনের জন্ত

নীল চীনে মাটির সৈকতে ভরা ধূসর ইস্পাহান
তোমায় গড়া
হয়েছিল বুঝি
টুকরো টুকরো আকাশ আর মাটি দিয়ে
মাঝখানে ছেড়ে রাখা হয়েছে
বিশাল একটা আলোর কোকর

এই

চৌকোণা চক শাহী ময়দান

লাকিয়ে লাকিয়ে চলা

সামান্ত কটা ছোট গাধার

পক্ষে খুবই বিবট

আব সাদা ছাতার তলায় ঠাই পাওয়া

দাড়িওয়াল। ঐ তরুণ বণিকদেব মত দেখতে

স্বর্ষের

মেহেদি বাভানো দাড়িব দিকে

তাকিয়ে গাধাগুলি

এমন চমৎকাব ডাক ছাড়তে জানে

এখানে আমি বসেছি পপলাব গাছগুলিব সহোদব

ইয়োরোপের সন্ততিদেব মধ্যে সুন্দব পপলাবগুলিকে চিনে নাও

হে আমার কম্পিত সহোদববা এশিয়ায় যাবা প্রার্থনা করছ

বক্স হবিণের শিঙের মতন বাঁকানে। একজন পথচারী

গ্রামোফোন

হিজিবিজি লেখা

ছোট্ট দোকান

পুঙ্কন দাশগুপ্ত

স্বক

লডাইয়ের কেন্দ্রীয় ধমনী

শ্রুতির মাধ্যমে যোগাযোগ

‘শোনা আওয়াজের’ দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়া হয়

১৯১৫-র তরুণেরা

আর বিদ্যুৎবাহী লোহার তারগুলি

যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে তাই আর কেঁদো না
 এর আগে আমাদের ছিল কেবল
 ভূপৃষ্ঠ আর সমুদ্রপৃষ্ঠ
 এর পর আমরা পাবো অভল গহ্বর
 ভূগর্ভ আর বিমান চালনার আকাশমার্গ
 কর্ণধার
 তারপর তারপর
 আমরা পাবো সবটুকু আনন্দ
 সেই বিজয়ীদের যারা আরাম করে
 নারী জুরা কারখানা খাতু
 আশুন ফটিক গতি
 কণ্ঠ দৃষ্টি একান্ত স্পর্শ
 আর একই সঙ্গে দূর
 আরো দূর
 এই পৃথিবীর ওপর থেকে আসা স্পর্শের মধ্যে

পুঙ্খ নাসিক

নিজের ওপরও...

নিজের ওপরও আমার আব কোন করুণা নেই
 নিজের স্বকৃত্যের যজ্ঞগাকে আমি প্রকাশ করতে পারি না
 যে কথাগুলি আমার বলার ছিল সেগুলি সব
 তারার পরিণত হয়েছে
 কোন এক ইকারুস আমার প্রতিটি চোখ অবধি উঠে আসতে
 চেষ্টা করে
 আর স্বর্গালোকের বাহক আমি ছই ছাড়াপথের
 মাঝখানে দন্ড হই
 বুদ্ধির ধর্মতাত্ত্বিক জানোয়ারগুলিকে আমি কি করেছি

এককালে বারা বারা গেছে তারা আমার সমাধর করতে কিনে এল
আমি আশা করেছিলাম জগতের সমাপ্তি
অথচ আমার সমাপ্তি দুর্ধিষড়ের মত সৌ সৌ শব্দে উপস্থিত হয়

পুঙ্খ নানতত্ত্ব

আমার বাগানে

সত্যি আমরা যদি সত্তেরোশ বাট সালে বেঁচে থাকতাম
এই পাথরের বেঞ্চটার ওপর তুমি যা পাঠোছার করলে, আনা,
এটাই কি ঠিক সেই তারিখ

আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হতাম জার্মান
আর ভাগ্যক্রমে তোমার কাছে থাকতাম
আমরা আবোল ভাবোল ভালোবাসার কথা বলে যেতাম
সারাক্ষণ প্রায় করাসিতে

আর আত্মহারাভাবে আমার বাহুল্য হয়ে
তুমি স্তনতে পেতে আমি তোমার পিথাগোরাসের কথা বলছি
আর একইসঙ্গে আধঘণ্টার মধ্যে যে কফি খাওয়া হবে
তার কথাও ভাবতে ভাবতে

আর হেমন্ত হোত এই হেমন্তের মতই
আঙুরলতা আর বৈচিত্র মুকুট মাথায়

আর বারবার চকিতে খুব হুয়ে পড়ে আমি অভিবাদন করতাম
নধরকান্তি আর চিমেতেতালনা সম্রাজ্ঞ মহিলাদের

দীর্ঘ সায়াকুলিতে

একা একা আর ধীরেস্থে আমি সেবন করতাম
গাঢ় ভোকে কিংবা মালভোয়াজি
আমার হিম্পানী পোশাকটা আমি পরে নিতাম
জার্মান বুঝতে যিনি বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নন আমার সেই দিদিমা
তার পুরনো ষোড়ার গাড়িতে

যে গল্প ধরে আসেন সে হাতার বাঁওয়ার জন্ত
তোমার তনুগল, গ্রামীণ জীবন আর আশেপাশের
মহিলাদের নিয়ে
আমি পুরাণকাহিনী ভরা গল্প লিখতাম

প্রায়ই কোন চাষার পিঠে আমি
আমার ছড়ি ভাঙতাম

শুয়োরের মাংস খেতে খেতে সংগীত শুনতে
আমি ভালোবাসতাম

আমি তোমায় দিব্যি গেলে বলছি তুমি যখন
ঐ লালচুল ঝিটার ঠোটে ঠোট লাগিয়ে চুমু খেতে আমার ধরে ফেলতে
তখন আমি জার্মান ভাষায় দিব্যি গালতাম

মার্চেল বনে তুমি আমার ক্ষমা করে দিতে

একটুখানি গুনগুন করে আমি সুর ভাঁজতাম
তারপব অনেকক্ষণ কান পেতে আমরা শুনতাম গোহুলির শব্দ

১৯১২

পুঙ্কর দাশগুপ্ত

বিজয়

একটি মোরগ ডাকছে আমি স্বপ্ন দেখছি আর পাতাভরা ভাল
ভাদের পাতা দোলাচ্ছে দেখতে হতভাগা জাহাজীদের মত

জাল ইকারসের মত ডানাওয়ালা আর ঘুরতে থাকা
অন্ধেরা পিঁপড়ের মত হাত পা ছুঁড়ছে
ঝুটতে ফুটপাতে আলোর প্রতিফলনে ওরা নিজেদের দেখছিল

ওদের হাসি আঁড়রের খোকার মত টাল করা

যদি আমার যে তুমি কথা বলছিলে তোমার ঘর ছেড়ে আর বেরিয়ে না
শান্ত হয়ে ঘুমোও তোমার নিজের ঘরেই তুমি রয়েছে। সবকিছুই তোমার
আমার বিছানা আমার বাতি আর আমার ফুটে হয়ে যাওয়া লোহার টুপি

চাউনি স্যা-ক্লোদের আশেপাশে কাটা দামী নীলা

দিনগুলি ছিল এক একটা নিখুঁত পায়াল

তোমাকে আমার মনে পড়ে উষ্ণ শহর

যে রাতগুলিতে কিছুই ঘুমোত না তখন ওরা শুষ্টে ফুটে উঠত
আলোর বাগানগুলি যেখানে আমি ফুলের স্তবক চয়ন করেছি

ঐ আকাশকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার ক্লান্ত হওয়ার কথা

সে তার হেঁচকি সামলে রাখুক

কল্পনা করা কঠিন

সাক্ষ্য লোককে কতখানি নির্বোধ আর নিশ্চেষ্ট করে তোলে

তরুণ অন্ধদের পরিষদে জিজ্ঞাসা করা হোল

আপনাদের কি কোন ডানাওয়াল। তরুণ অন্ধ নেই

হে মুখগুলি, মানুষ নতুন এক ভাষার সন্ধানে

যার সম্পর্কে কোন ভাষার ব্যাকরণবিদের কিছুই বলার থাকবে না

আর এই পুরনো ভাষাগুলি এমনই মরোমরো

যে প্রকৃতপক্ষে অভ্যাসবশে আর হুঃসাহসের অভাবে

এখনো তাদের কবিতায় ব্যবহার করা হচ্ছে

অথচ ওরা বীভৎস হুঃসাহসের মত

বলছি তো লোকে অবিলম্বে নীরবতার অভ্যাস হয়ে উঠবে

চলচ্চিত্রে মুকাভিনয়ই যথেষ্ট

তবু এসো কথা বলার গৌ ধরি

এসো জিব নাড়াই

এসো থুথু ছোটাই

লোকে চায় নতুন ধনি নতুন ধনি নতুন ধনি

লোকে চায় স্বরধনিহীন ব্যঞ্জন

গভীর ভারী ব্যঞ্জন

লাঠির ধনির আত্মকরণ কর

বিরামহীন অহুনাগিক একটা ধনিকে টিকটিক করে যেতে দাও

জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ কর

অসভ্যের মত যে খায় তার চাপা আওয়াজকে ব্যবহার কর

থুথু কেলার মহাপ্রাণ বর্ষণধনিও চমৎকার একটা ব্যঞ্জনধনি তৈরী করতে পারে

বিচিত্র ওষ্ঠ্য বায়ুনিঃসরণও তোমার উক্তিকে দিব্যদৃষ্টিময় করে তুলতে পারে

বধন থুশি ঢেকুর তুলতে অভ্যস্ত হও

আর আমাদের স্বৃতির ভেতর দিয়ে গির্জের একটা বন্টধনির তুলনায়

কোন বর্ণটাই বা গাভীরূপূর্ণ

সুন্দর নতুন জিনিস দেখার আনন্দ

আমরা থুব একটা পছন্দ করি না

সখি আমার ভরা করো

মনে রেখো, রেলগাড়ি তোমাকে আর মুগ্ধ নাও করতে পারে

তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকাও

ঐ চলন্ত রেলপথগুলি

অবিলম্বে জীবনের গভীর বাইরে চলে যাবে

ওগুলো হয়ে যাবে সুন্দর আর হাস্তকর

আমার সামনে দুটি আলো জ্বলছে

দুটি নারী যেন হিহি হাসছে

দীপ্ত তামাসার সামনে

আমি বিষমভাবে মাথা নোয়াই

ঐ হাসি ছড়িয়ে পড়ে

সর্বত্র

হাতের ডব্বিতে কথা বল আঙুল দিয়ে তুড়ি দাও

ভবলা বাজানোর মতো গালের ওপর চাঁট মারো
আহা কথাগুলি
ওরা মার্চেলের বনে
অঙ্গসজল কাম ও নিকামের পিছু নেয়
আমি মহানগরীর আকাশ

সমুদ্রের দিকে কান পাতে

সমুদ্র দূরে গোড়ায় আর একা একা চিংকার করে
ছায়ার মত বাধ্য আমার কণ্ঠস্বর
অবশেষে জীবনের ছায়া হতে চায়
হতে চায় হে প্রাণময় সমুদ্র তোমার মতন অবাধ্য

যে সমুদ্র অসংখ্য নাবিকের প্রতি বিশ্বাস-বাতকতা করেছে
ডুবে যাওয়া দেবতাদের মত আমার প্রচণ্ড চিংকার সে গিলে ফেলে
আর সূর্যালোকে ডানা বিস্তার করা পাখিদের ফেলা ছায়া ছাড়া
সমুদ্র আর কিছুই বরদাস্ত করে না

উক্তি আকস্মিক আর কোন এক ঈশ্বর শিহরিত হয়
এগিয়ে এসো আর আমার ধরো আমি অল্পতাপ করছি তাদের সেই
হাতগুলির জন্ত

যারা তা বাড়িয়ে দিতো আর সবাই মিলে আমার সমাদর করত
আগামীকাল বাহর কোন্ মরুস্থান আমার অভ্যর্থনা জানাবে
নতুন জিনিস দেখার সেই আনন্দ তুমি জানো কি

হে কণ্ঠস্বর আমি সমুদ্রের ভাষা বলছি
আর বন্দরে রাত্রি শেষ সরাইখানাগুলি
আমি লের্ন এর হারড্রা যতটা নয় তার চেয়ে বেশি গৌরৱ

শহরে খাঁটাখাঁটি করা নিপুণ আঙুল নিয়ে
আমার দুহাত বেখানে সীতার কাটে সেই রাস্তা
চলে যায় অধচ কে জানে আগামীকাল
রাস্তা অনড় হয়ে যাচ্ছে কি না
কে জানে কোথায় হবে আমার পথ

ভেবে দেখো রেলপথ

অন্ধকালের মধ্যে অচল আর বাতিল হয়ে যাবে

তাকাও

সবার আগে জয় হবে

দূরে ভালো করে দেখার

কাছ থেকে

সব কিছু দেখার

আর সব কিছুর নতুন একটা নাম হোক

পুঙ্খন দাশগুপ্ত

হাউই সংকেত

নিভৃত রাত্রিতে গ্রামগুলি দাঁড় দাঁড় করে জ্বলছিল

একজন কৃষক গালভেস্টনের দিকে তার মোটরগাড়ি

চালিয়ে নিয়ে যায়

কে ঐ হাউই-সংকেত ছুঁড়েছে

তবুও দরজাটা তোমার খোলা রাখলেই ভালো হয়

আর তারপর বাতাস কাঠ চেরাই করা করাভীর মত

তোমার মধ্যে ভূতের আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবে

তোমার জিভ

তোমার কণ্ঠস্বরের কাচের জারে

লাল মাছ

অথচ ঐই অল্পতাপ

প্রায় ঠিক যেন চোখ ধাঁধানো শীতের চেয়ে সালা একটা নার্স

দিগন্তে যখন মিলিয়ে যায়

দিনগুলির একটা পল্টন দূরের পাহাড়গুলির চেয়ে

নীল আর মোটরগাড়ির গদি যতটা না তার চেয়েও নরম

পুঙ্খন দাশগুপ্ত



ব্রেজ সঁত্রারের কবিতা

POEMES DE BLAISE CENDRARS

ব্রেজ সঁজার

সদীভশিরীষের উৎসর্গিত

ট্রান্সাইবেরিয়ান আর ক্রালের
ছোট আনের গল্প

সে সময়ে আমি ছিলাম কিশোর

সবে বোল বছর আমার বয়স আর ইতিমধ্যেই ছেলেবেলার কথা

আমার আর মনে পড়ছিল না

আমি ছিলাম আমার জন্মস্থান থেকে ৪৮০০০ মাইল দূরে

আমি ছিলাম মস্কোয়, হাজার তিনটি গির্জের চূড়ো আর সাতটি

স্টেশনের শহরে,

আর সাতটি স্টেশন আর হাজার তিনটি গয়ুজ আমার অসহ্য হয়ে ওঠে নি

কেননা আমার কৈশোর ছিল এমন গনগনে আর এমন উন্মাদ যে

আমার হৃদয় জ্বলতে থাকত বারেবারে ইকিঙ্গাস-এর মন্দিরের

মত অথবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়

মস্কোর রেড স্কোয়ারের মত ।

আর আমার চোখ প্রাচীন পথগুলি আলোকিত করত ।

আর তখনই আমি এমন বাজে কবি হয়ে গিয়েছিলাম যে

শেষ অব্দি পৌঁছতে আমি জানতাম না ।

ক্রেমলিনটা ছিল যেন একটা প্রকাণ্ড ভাতার কেক

মচ্‌মচে সোনার,

ভাতে ধবধবে সাদা ক্যাথিড্রালগুলির বাদাম

আব ঘণ্টাগুলির মধুময় সোনা...

বুড়ো এক সন্ন্যাসী নভ্‌গরোদ-এব ইতিকথা আমায় পড়ে শোনাও

আমার ভেঁটা পেত

আর কৌণিক হরকগুলির আমি পার্থোদ্ধার করতাম

তারপর, আচম্‌কা, পবিত্র-আত্মার পায়রাগুলি স্কোয়ারের

ওপর দ্বিগুণে উড়ে চলে যেত

আর আমার হাতছাটিও উড়ে যেত, আলবাইসের গুঞ্জরণে
আর এটা, এটাই হল শেষ অস্পষ্ট স্মৃতি শেষ দিনের
একেবারে শেষ ভ্রমণের
আর সন্মুখের ।

তবুও আমি ছিলাম নিতান্ত বাজে কবি ।
শেষ অব্দি পৌঁছতে আমি জানতাম না ।
আমার বিদে পেত
আর সবকটা দিন আর কাকের মধ্যে সবকটা নারী আব
সবকটা গেলাস
পারলে আমি তাদের পান করে নিতাম আর ভেঙে দিতাম
আর সবকটা শোকস আর সবকটা রাস্তা
আর সবকটা বাড়ি আর সবকটা জীবন
আর রাস্তার এবড়োখেবড়ো শানের ওপর ঘূর্ণিবেগে ঘুরপাক খাওয়া
ছাকড়া গাড়ির সবকটা চাকা
পারলে আমি ওদের তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের মাঠে ঢুকিয়ে দিতাম
পারলে আমি সবকটি হাড় গুঁড়িয়ে দিতাম
আর সবকটি জিব টেনে বের করে আনতাম
আর আমার মাথা খারাপ করা পোশাকের তলার সবকটি উলঙ্গ আব
অঙ্কুরিত বিরাট শরীর তরল পদার্থে পরিণত করতাম...
ক্লান্ত বিপ্লবের বিরাট লাল খুঁটের আবির্ভাবের পূর্বাভাস আমি
অনুভব করছিলাম...
আর স্মৃতি ছিল একটা ছুঁই ক্ষত
কব্জলার আগুনের মতো যার মুখ খুলে যেত ।

সে সময়ে আমি ছিলাম কিশোর
সবে বোল বছর আমার বয়স আর ইতিমধ্যেই ছেলেবেলার কথা আমার
আর মনে পড়ছিল না
আমি ছিলাম মঞ্চের, সেখানে নিজেকে আমি আগুনের সিঁথার
লালন করতে চাইছিলাম

আর বারা আমার চোখে ভারকা ছড়িয়ে দিচ্ছিল সেই

গম্বুজ আর স্টেশন আমার অসহ করে তোলেনি

সাইবেরিয়ার কামান গর্জাচ্ছিল, যুদ্ধ চলছিল

কুখা শীত মহামারী কলেরা

আয়ুরের ঘোলা জলধারা লক্ষ লক্ষ শব্দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল

সবকটা স্টেশনে সবকটা শেব ট্রেনকে ছেড়ে যেতে দেখছিলাম

কেউ আর যেতে পারছিল না কেননা আর টিকিট দেওয়া হচ্ছিল না

যে সৈনিকরা চলে যাচ্ছিল পারলে ওরা থেকে যেত...

বুডো এক সন্ন্যাসী আমার নভ্‌গরোদ-এর ইতিকথা গেয়ে শোনাচ্ছিল।

আমি, বাজে কবি, কোথাও যেতে চাইছিলাম না,

সর্বত্র আমি যেতে পারতাম

আর তাছাড়া পরসা কামানোর চেষ্ঠায় যাওয়ার জগ

ব্যবসারীদের তখনো যথেষ্ট টাকাকড়ি ছিল।

প্রতি শুক্রবার ভোরবেলা ওদের ট্রেন ছাড়ছিল।

লোকে বলছিল বহু লোক মারা গেছে।

একজন নিয়ে যাচ্ছিল একশ পেট এলার্ম ঘডি আর ব্র্যাক করেস্টের

কোকিল-ডাকা ঘডি

আরেক জন, টুপি বাস, সিলিগুর আর একগাদা নানান ধরনের

শেকিন্ডের ছিপিবোলায় যজ

আরেক জন, মালমোএ-র কিছু ককিন ভর্তি কোঁটোর ভরা ধাবার

আর তেলে ডোবানো সার্ডিন

এছাড়া ছিল বহু মেয়েমানুষ

মেয়েমানুষ ভাড়া দেওয়ার জগ পারের ফাঁকের আচ্ছাদন বাদে দিবে

কাজ চলে

ককিনেরও

মেয়েমানুষগুলো সব ট্রেড লাইসেন্স করা

লোকে বলছিল ওখানে বহু লোক মারা গেছে

মেয়েমানুষগুলো কনসেন্স টিকিটে যাচ্ছিল

আর তাদের প্রত্যেকের ব্যাংকে এক একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল।

এবার, শুক্রবারের এক সকালে, অবশেষে এল আমার পালা

তখন ডিসেম্বর মাস

আর গরমার এক ক্যানভাসার খারবিন-এ যাচ্ছিল তার সঙ্গে

আমিও বেরিয়ে পড়লাম

এক্সপ্রেস ট্রেনে আমাদের ছিল দুটি খুপরি আর সঙ্গে ফরংজাইমের

জহরতের ৩৪টা পেটি

জার্মান মাল “মেড ইন জার্মানী”

লোকটা আমার নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল আর ট্রেনে চড়ার

সময় আমি একটা বোতাম হারিয়ে কেলেছিলাম

—কথাটা আমার মনে আছে, কথাটা আমার মনে আছে, তারপর থেকে কথাটা

আমি প্রায় ভেবেছি—

পেটির ওপর আমি শুয়ে ছিলাম আর লোকটা আমার চকচকে যে ট্রাউনিং

পিন্ডলটাও দিয়েছিল ওটা নিয়ে খেলতে পারার আমার খুব মজা লাগছিল

আমি বেপরোয়া খোশমেজাজে ছিলাম

মনে হচ্ছিল ডাকাত ডাকাত খেলছি

আমরা গোলকুণ্ডার ধনভাণ্ডার লুণ্ঠ করেছি

আর ট্রান্সসাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসের দৌলতে, আমরা তাকে

পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে লুকিয়ে রাখতে চলেছি

তাকে রক্ষা করতে হবে যাবা জুল ভের্ন-এর বেদেদের আক্রমণ

কঁবেছিল সেই উরালেব নুঠেরাদের হাত থেকে

খুজ্জদের হাত থেকে চীনেব গ্রহরী কুকুবদের হাত থেকে

আর দালাই লামার খ্যাপা বেঁটে মোঙ্গলদের হাত থেকে

আলিবাবা আব চল্লিশ চোরের হাত থেকে

আর পাহাড়েব সেই ভয়ংকর বুড়োর সাকুরেদদের হাত থেকে

আর বিশেষ করে, সবচেয়ে আধুনিকদের হাত থেকে

হোটেলের সিঁখেলদের

আর আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের বিশেষজ্ঞ ডাকাতদের হাত থেকে ।

আর তা সত্ত্বেও, আর তা সত্ত্বেও

একটা বাচ্চা ছেলের মত আমার মন খারাপ লাগছিল
 ট্রেনের ধোলা
 আমেরিকান মনোরোগ চিকিৎসকদের 'রেলপথ গুট্টেবা'
 দরজার—গলার স্বরের—শীতে জমে যাওয়া লাইনের ওপর ঝাঁচঝাঁচ
 করা চাকার ধুরার আওয়াজ
 আমার ভবিষ্যতের সোনার পাত
 আমার ব্রাউনিং পিস্তল পিয়ানো আর ট্রেনের পাশের কাষরায়
 ভাস-খেলোয়াড়দের দিব্যিগালা
 জ্ঞান-এর মনমাতানো উপস্থিতি
 নীল চশমা পরা লোকটা যে অস্থিরভাবে অলিন্দে পায়চারি করছিল
 আর যেতে যেতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল
 মেয়েদের ঘষাঘষির শব্দ
 আর বাস্পের হিস্‌হিস্
 আর আকাশের চিহ্নিত পথে উন্নত চাকার অস্বহীন শব্দ
 শার্সিব কাচ ঢাকা তুষারকণায়
 নিসর্গ নেই !
 আর পেছনে, সাইবেরিয়ার প্রান্তর নিচু আকাশ আর বিরাট বিরাট ছায়া
 একবার ওঠে একবার নামে
 আমি শুয়ে আছি একটা কঞ্চল মুড়ি দিয়ে
 কঞ্চলটা রঙবেরঙ
 আমার জীবনের মত
 আর আমার জীবন স্ফটল্যাণ্ডের
 এই আলোয়ানের চেয়ে
 আমাকে বেশি গরম করে রাখে না
 আর উর্ধ্ব্বাসে ছোট্টা একটা এক্সপ্রেস ট্রেনেব হাওরাকাটা নাকে
 দেখা পুবো ইয়োরোপটা
 আমার জীবনের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ নয়
 আমার রিক্ত জীবন
 এই ফেসে যাওয়া আলোয়ান
 সোনা ভর্তি পেটিগুলোর ওপর

বাধের নিরে আমি ঘুরছি

যথ দেখা বাক

সিগারেট খাওয়া বাক

আর মহাবিশ্বের একমাত্র অগ্নিশিখা

একটা নগ্ন চিত্তা...

ওগো ভালোবাসা, আমার প্রণয়িনীর কথা ভাবলে

হৃদয়ের গভীর থেকে আমার চোখে জল আসে

ও তো বাচ্চা একটা মেয়ে ছাড়া কিছুই নয়, এক বেস্তাবাড়ির অন্দরমহলে

ওকে আমি খুঁজে পেলাম এরকম স্নান, নিষ্কলংক।

বাচ্চা একটা মেয়ে কেবল, সোনালি চুল, হাসিখুসি আর মনমরা

সে স্বিতহাসি হাসে না বা কখনো কাঁদে না ;

কিন্তু তার চোখের গভীরে, যখন সে তোমাকে সেখানে চুম্বক দিতে দেয়,

থরথর করে কবির ফুল, রূপোর একটা কোমল লিলি।

মেয়েটি নিশ্চুপ আর শান্ত, তার কোন ক্রটি নেই,

তোমার কাছে আসায় বহুক্ষণ কঁপে কঁপে ওঠে ;

এখান সেখান থেকে, উৎসব থেকে আমি যখন তার কাছে আসি,

সে এক পা এগোয়, তারপর চোখ বোজে—আর এক পা এগোয়

কেননা সে আমার প্রিয়া, আর অল্প সব নারীদের

অগ্নিশিখার দীর্ঘ শরীরের ওপর সোনার পোশাকই কেবল আছে,

আমার অভাগিনী সখি এমন নিঃসঙ্গ,

একেবারে সে নয়, তার কোন শরীর নেই—সে নিতাস্তই নিঃস্ব।

সে কেবল সাদাসিধে, ক্ষীণ একটি ফুল,

কবির ফুল, সামান্ত একটা রূপোর লিলি,

একেবারে শীতল, একেবারে একা, আর এরই মধ্যে এমন শুকিয়ে যাওয়া যে

তার হৃদয়ের কথা ভাবলে চোখে আমার জল আসে।

আর এই রাতটা আরো একলক্ষ রাতের মতন যখন রাতের বেলা

একটা ট্রেন ছুটে চলে

—খুবকেতুগুলি খসে পড়ে—

আর যখন বরষ কাঁচা হলেও পুরুষ আর নারী আনন্দ পায় সময়ে ।

আকাশটা ক্ল্যাণ্ডার্সে জেলেদের ছোট্ট গ্রামে একটা গরীব সার্কাসের ছেঁড়া
তীব্র মতন

স্বর্ষ খোঁরা ওগরানো একটা লঠন

আর ট্র্যাপিজের সবচেয়ে ওপরে একটা মেয়েছেলে চাঁদ হরে আছে ।

ক্ল্যারিওনেট পিস্টন একটা তীক্ষ্ণ বাঁশি আর একটা রুদ্ধ ঢোল

আর এইতো আমার দোলনা

আমার দোলনা

সেটা সবসময় পিয়ানোর কাছেই থাকত আমার মা যখন বিটোকেনের

সোনাটা বাজাতেন

আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি ব্যাবিলনের তুলস্ব বাগানে

আর তুল পালিয়ে, স্টেশনে স্টেশনে ছেড়ে দিতে যাওয়া

ট্রেনগুলির সামনে

এখন, সবকটা ট্রেনকে আমি আমার পেছনে ছুটিয়েছি

বাজেল—টিবাক্টু

আমি ওভার্সি আর লে'শ'-র বোডার মাঠে বাজি ধরেছি

প্যারিস-নিউইয়র্ক

এখন, আমার সারা জীবনের পথ ধরে আমি সবকটা ট্রেনকে

ছুটিয়েছি

মাদ্রিদ-স্টকহোম

আর আমার সবকটা বাজি আমি হেরেছি

আছে শুধু এক প্যাটাগোনিয়া, প্যাটাগোনিয়া, বা আমার বিপুল বিষমভার

সঙ্গে খাপ খায়, প্যাটাগোনিয়া, আর দক্ষিণ সমুদ্রে একবার

পাভি দেওয়া

আমি পথ চলছি

আমি সারদক্ষণ থেকেছি পথে

আমি ক্রান্সের ছোট্ট জেআন-কে নিয়ে পথ-চলছি

ট্রেনটা একটা মারাত্মক লাফ মেয়ে ফের তার সবকটা চাকার ওপর বসে পড়ে

ট্রেনটা তার চাকার ওপর বসে পড়ে

ট্রেনটা সবসময় তার সবকটা চাকার ওপর বসে পড়ে

“ব্রেক, বল না, আমরা কি মৌমাছ, থেকে অনেক দূরে ?”

আমরা দূরে, জান, সাত দিন তুমি গাড়িতে চলেছ

তুমি মৌমাছ, থেকে দূরে, সেই মৌমাছ, -পাহাড় থেকে যে তোমাকে লালন
করেছে সেই সাক্ষে-ক্যর থেকে যার বৃকে তুমি মুখ ঝুঁজে ছিলে

অদৃশ্য হয় প্যারিস আর তার বিশাল অগ্নিকুণ্ড

তুধু রয়েছে আবহমান ছাই

ঝরে পড়া বৃষ্টিধারা

ফুলে ফেঁপে ওঠা পচে শুকিয়ে যাওয়া ভালপালার সুপ

পাক খেতে থাকা সাইবেরিয়া

ছড়িয়ে পড়া তুবারের ভারী চাদর

আর নীল হয়ে যাওয়া শূন্যে অস্তিম বাসনার মত কাঁপতে

থাকা খ্যাপামির ষণ্টা

সীসার রঙ দিগন্তের বৃকে ট্রেন ধুক ধুক করে চলে

আর তোমার বেদনা মুখ বিকৃত কবে হাসে...

“বলনা, ব্রেক, আমরা কি মৌমাছ, থেকে অনেক দূরে ।”

উষেগ

ভুলে যাও উষেগ

ষাভাপথে সবকটা কাটলপড়া বাকানো স্টেশন

সেগুলি ষাতে বুলে রয়েছে সেই টেলিগ্রাফের তার

ওদের টুঁটি টিপে ধরা আব হাত পা ছোঁড়া দাঁত-খিচানো ষাষাগুলি

সংসার হাত পা ছড়িয়ে দেয় আব ধ্বংসামী কোন হাতে নিপীড়িত

অ্যাকর্ডিয়ানের মত সঁধিয়ে ষায়

আকাশের কাটলগুলির ভেতর, খেপে যাওয়া ইঞ্জিনগুলো

উধাও হয়ে ষায়

আর গর্তের মধ্যে

মাথা হুরিয়ে দেওয়া চাকাগুলি—মুখ—গলার স্বর
আর আমাদের পেছনে পেছনে বেউ বেউ করা হুর্জাগের কুকুরগুলি
দৈত্যগুলিকে শৃংখলযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে

লোহালকড়

সবকিছু একটা তুল স্বর

চাকার বুম বুম বুম

ধাকা

আবার লাক

আমরা একজন কালা লোকের মাথার ভেতর ঝড়...

“বলনা, রেজ, আমরা কি মৌমাত্রা থেকে অনেক দূবে?”

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমার মাথা তুমি খারাপ করে দিচ্ছ, তুমি তা বেশ জানো,
আমরা অনেক দূবে

টগবগ করা উল্লান্না ইঞ্জিনের ভেতর ডাক ছাড়ছে

কলেরা মহামারী আমাদের চলার পথে জলন্ত অন্ধারের মতো দেখা দিচ্ছে

সুড়ঙ্গের একেবারে ভেতরে যুদ্ধে আমরা অদৃশ্য হই

খানকী ক্ষুধা ছত্রখান মেঘগুলোকে আঁকড়ে থাকে

আর লড়াইয়ের বিষ্ঠা শবদেহের দুর্গন্ধ গাছায়

ওর মতো করো, নিজের কাজ কর.....

“বলনা, রেজ, আমরা কি মৌমাত্রা থেকে অনেক দূবে?”

হ্যাঁ, আমরা দূরে আমরা দূরে

সবকটা বলির পাঠা এই মরুভূমিতে টেসে গেছে

ঐ যেহো জানোয়ারের পালের ঘণ্টাধ্বনি শোন তোমুক্ষ

চেলিয়াবিনক্ষ কেইনক্ষ ওবি তাইশেং ডের্কেনে

উদ্দিনক্ষ কুর্গান সামারা পেনসা-তুলুন

মাঝুরিয়ায় যুতুই হলো

আমাদের কুলের ঘাট আমাদের শেষ আশ্রয়

ভয়ানক এই যাত্রা

গতকাল সকালে

ইতান উলিচের চুল সাধা হয়ে গেল
আর কোলিয়া নিকোলাই ইতানোভিচ পনের দিন বাবু আডুল কামড়াচ্ছে
বুড়ো ছুঁতক ওদের মত হও নিজের কাজ কর
এর দাম একশ পরসা, হীল সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসে এর দাম একশ কবল
জর গারে গদি আঁটা বেঞ্চি আর টেবিলের ডলার লালচে হয়ে ওঠে
শয়তান পিয়ানো বাজাচ্ছে
ডার গাঁওওয়াল আডুল সমস্ত নারীকে উত্তেজিত করে
নিসর্গ

হেনিগুলি

নিজের কাজ কর

ধারবিন পর্যন্ত.....

“বলনা, রেজ, আমরা কি মৌমাজ্ থেকে অনেক দূরে?”

না তবে...আমার আলিয়ো না...আমার শান্তিতে থাকতে দাও
তোমার পাছাগুলো ছুঁ চলো

তোমার পেট টকো আর তোমার গনোরিয়া হয়েছে

পারী তোমার কোলে এই শুধু দিয়েছে

একটুখানি অন্তরও...কেননা তুমি ছুঁখী

আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কাছে এসো আমার বুকের ওপর

চাকাগুলি সবপেরেছির দেশের হাওয়া কল

আর হাওয়া কলগুলি ভিথিরির ঘোরাতে থাকা লাঠি

আমরা মহাশুস্তের পা-কাটা আতুর

আমাদের চারটে ক্ষতের ওপর আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি

আমাদের ডানাগুলি কামড়ে নেওয়া হয়েছে

আমাদের সাঁজটি পাপের ডানা

আর সবকটা ট্রেন শয়তানের লাটিম

হীল-মুরগি থাকার পেছনের উঠোন

আধুনিক জগৎ

দূরবর্তী আরো অনেক দূরে

আর রাজাপথের শেষে একজন মেয়েমাহুয সঙ্গে নিয়ে পুরুষ হওয়াটা ভয়াবহ--

“বলনা, ব্রেক, আমরা কি যোঁয়ার্জ্ থেকে অনেক দূরে ?”

আমার দয়া হচ্ছে আমার দয়া হচ্ছে

আমার বিছানায় এসো

আমার বুকের ওপর এসো

তোমার আমি একটা গল্প বলছি...

আহা এসো ! এসো !

কিভি দ্বীপপুঞ্জে অনন্ত বসন্ত বিরাজ করে

আলস্ত

লহা লহা ঘাসের ভেতর নারী-পুরুষকে অনড় করে দেয়

আর তপ্ত উপদংশ কলাঝাড়ের নিচে এদিক ওদিক

ঘুরে বেড়ায়

প্রশান্ত মহাসাগরের হারিয়ে যাওয়া দ্বীপগুলিতে চলো !

ওদের ফিনিক্স আর মার্কিজ্-এর নাম রয়েছে

বোর্নিও আর জাভা

আর বেড়ালের আকৃতি স্লামবেশী দ্বীপ

আমরা জাপানে যেতে পারব না

মেক্সিকোতে চলো !

উচু উচু মালভূমির ওপর ট্যালিপ গাছগুলি ফুলে ভরা

বাড়ন্ত লতাগুল্ম স্বর্গের চুলের গোছা

বলা বাহু চিত্রকরের রঙদানি আর তুলির গোছা

ঘণ্টাপেটানোর মত কানে তালা লাগানো রঙ

কসো ওখানে ছিল

ওখানে সে তার জীবনের চোখ ঝলসে দিয়েছে

স্বর্গের পাখি, লায়ার

টুকান, মকিং বার্ড

আর মধুচুষ কালো লাইলাকের বুকে বাসা বাঁধে

চলো !

কোন আজটেক মন্দিরের বিপুল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা প্রেম করব
তুমি হবে আমার প্রতিমা
বাচ্চাদের রঙবেরঙ প্রতিমা একটু কুৎসিত দেখতে আর অদ্ভুতভাবে আশ্চর্য
ওগো চলো !

তুমি যদি চাও আমরা এরোগেনে যাবো আর হাজার হ্রদের
দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো
রাত সেখানে অতিরিক্ত দীর্ঘ
প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ আমার মোটর দেখে ভয় পেয়ে যাবে
আমি মাটিতে নামব
আর ম্যামথের কসিল হাড় দিয়ে আমি আমার বিমানের জন্ত
একটা ছাউনি তৈরী করব
আদিম আশুন আমাদের হতভাগ্য ভালোবাসাকে উত্তপ্ত করবে
মেকর কাছাকাছি আমরা নিজেদের বেশ বড়লোকী চালে
ভালোবাসব
ওগো চলো !

জান জানসোনা থুকুমণি মণি মেনি মেনা
বিল্লীসোনা আছরে আমার আমার থুকু সোনার খনি
ধুমধুম গোলগাল
গাজর আমার-লেবেকুম
সোনামণি আমার প্রাণ
পাজী মেয়ে
প্রাণের আমার ছাগলছানা
খনখন
টুকি
সে ঘুমোর ।

সে ঘুমোর
আর পৃথিবীর সবকটা সময়ের একটাও সে গিলে কেলে নি

স্টেশনে স্টেশনে চকিতে দেখা সবকটা মুখ

সবকটা ঘড়ি

প্যারিসের সময় বার্লিনের সময় সেন্ট পিটার্সবুর্গের সময়

আর সবকটা স্টেশনের সময়

আর উষ্ণ, গোলন্দাজের রক্তমাখা মুখ

আর গ্রানো-র অর্থহীনভাবে উজ্জল ডায়াল

আর ট্রেনের নিরন্তর এগিয়ে চলা

রোজ সকালে লোকে হাতঘড়ি মিলিয়ে নেয়

ট্রেন এগিয়ে যায় আর সূর্য পিছিয়ে পড়ে

কিছুই তাতে ঘটে না, সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনতে পাই

নন্দাদামের গম্ভীর, বিশাল ঘণ্টা

লুভ্‌ব্‌-এর তীব্র সেই ঘণ্টা যা বার্তেলেমি-তে বেজেছিল

ক্রজ-লা-মর্ত-এর মরচে পড়া ঘণ্টা

হ্যু ইয়র্ক গ্রাহাগারের বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

ভেনিস অভিযান

আর মস্কোর ঘণ্টাগুলি, লাল কটকের ঘড়ি

আমি যখন একটা দপ্তরে ছিলাম যে আমাকে সময়ের হিসেব দিত

আর আমার যত স্মৃতি

বাঁকগুলিতে ট্রেন গুমগুম করে চলে

ট্রেন ছুটে চলে

গ্রামোকোনে একটা জিপসি গৎ ঘরঘর করছে

আর জগৎসংসার, প্রাগের ইহুদীপাড়ার ঘড়ির মত প্রাণপণে

উন্টো ঘুরছে ।

বাতাসের গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ফেল

এই যে শেকল ছেঁড়া ঝড়গুলি আওয়াজ তুলছে

পথের জড়ানো জালের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে দুর্ধিবেগে

শয়তানের লাটিম

কিছু কিছু ট্রেন কখনো একে অস্ত্রের দেখা পায়না

আর কতগুলো চলতে চলতে হারিয়ে যায়

স্টেশনমাস্টাররা দাবা খেলে
পাশা
বিলিয়ার্ড
এক গুলিতে দু'গুলি ছোঁয়া

রেলের লৌহপথ নতুন এক জ্যামিতি
সাইরাকিউজ
আর্কিমিডিস
আর যারা তার মুণ্ড কেটেছিল সেই সৈন্তেরা
আর দাঁড়টানা জাহাজ
আর জলযান
আর যে বিশ্বয়কর যন্ত্র তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন
আর যত সব হত্যাকাণ্ড
পুরাকালীন ইতিহাস
আধুনিক ইতিহাস
ঘূর্ণিঝড়
জাহাজডুবি
এমনকি টাইটানিকের ডোবাও যা আমি শবরের কাগজে পড়েছি
এত সব চিত্রাঙ্কন যা নিজের পক্ষে কখনো আমি ফুটিয়ে
তুলতে পারি না
কেননা আমি এখনো নিতান্ত বাজে কবি
কেননা বিশ্বজগৎ আমার পেরিয়ে চলে যায়
কেননা রেলপথে দুর্ঘটনার জ্ঞান বীমা করতে আমি
অবহেলা করেছি
কেননা শেষ অবধি যেতে আমি জানি না।
আর আমার ভয় করছে।

আমার ভয় করছে
আমি শেষ অবধি যেতে জানি না

আমার বন্ধু শাগালের মতো আমি একটা উদ্ভট চিত্রমালা

আঁকতে পারি

কিন্তু ভ্রমণের সময় কিছু টুকে রাখিনি

গীয়েম আপলিনের ঘেমন বলে

“আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করুন

পণ্ডের পুরোনো খেলাটা আমি আর জানিনা বলে আমার
ক্ষমা করুন”

মুহু সম্পর্কিত যা কিছু কুরোপাটকিন-এর স্মৃতিকথায়

পড়তে পারা যায়

অথবা এমন নিষ্ঠুরভাবে চিত্রিত জাপানী খবরের কাগজে

আমার অত খোঁজখবর নিয়ে লাভটা কি

স্মৃতির চমকে লাঞ্ছিত ঐশ্বর্য হাতে

নিজেকে সমর্পণ করি...

ইকুৎস থেকে যাত্রাটা হয়ে উঠল খুবই মন্থর

খুবই দীর্ঘ

প্রথম যে ট্রেনটি বৈকাল হ্রদ ঘুরে যাচ্ছিল আমরা তাতে ছিলাম

পতাকা আর চীনে লষ্ঠনে ইঞ্জিনটাকে সাজানো হয়েছে

জারের বন্দনাগীতির বিষয় রেশের মধ্যে আমরা স্টেশন ছেড়েছিলাম

চিত্রকর হলে এই ভ্রমণের শেষ আঁকতে অনেকটা লাল, অনেকটা হলুদ আমি

ঢালতাম

কেননা আমার ধারণা যে আমরা সবাই ছিলাম এক আধটু পাগল

আর এক বিপুল প্রলাপ আমাদের সহযাত্রীদের বিচলিত মুখকে

রক্তিম করে তুলছিল

যখন আমরা সেই মন্ডোলিয়ার কাছে এসে পৌঁছাছি

যে অগ্নিকাণ্ডেব মত গৌঁ গৌঁ করছিল।

ট্রেন তার গতিবেগ লুপ্ত করে দিয়েছিল

আর চাকার অবিস্তারিত ব্যাচিংগাচ আওয়াজের মধ্যে আমি

উপলব্ধি করছিলাম

এক চিরন্তন প্রার্থনাগীতির

কৌপানি আর ব্যাকুল সুর ।

আমি দেখেছি

আমি দেখেছি শব্দহীন ট্রেনগুলি কালো ট্রেনগুলি যেগুলি

দূরপ্রাচ্য থেকে ফিরে আসে আর ভূতের মতন চলে যায়
আর আমার চোখ, পেছনে ঝোলানো লঠনের মত, ঐ ট্রেনগুলোর
পেছনে পেছনে ছোটে

ভালগাতে ১০০০০০ আহত লোক চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখী

আমি ক্রাসনইআর্স্কে'র হাসপাতালগুলি ঘুরে দেখেছি

আর বিলোক-এ আমরা ক্ষিপ্ত সিপাহীদের দীর্ঘ একটা

সারির পাশ কাটিয়ে গেছি

আর চিকিৎসাকেন্দ্রে আমি দেখেছি অর্গানের চড়া সুরে বরবর করে

রক্ত বরা হাঁ করা ক্ষতমুখ

আর কেটে বাদ দেওয়া প্রত্যঙ্গগুলি চারপাশে নাচছিল বা

ভারী হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল

সবগুলি মুখে সবগুলি হৃদয়ে অগ্নিকাণ্ড

হাবা আঙুলগুলি সবকটা কাচের শার্সিতে ভাল ঠুকছিল

আর ভয়ের চাপে চাউনিগুলি ফোড়ার মত কেটে পড়ছিল

সবকটা স্টেশনে সবকটা গাড়ির কামরা পোড়ানো হচ্ছিল

আর আমি দেখেছি

আমি দেখেছি কামার্ত দিগন্তগুলির তাড়া পাওয়া ৬০ ইঞ্জিনেব ট্রেনগুলি

আর তার পেছনে পেছনে মরিয়া হয়ে উড়ে যাওয়া

পালে পালে কাককে

পোর্ট-আর্থারের পথ ধরে

অদৃশ্য হয়ে যেতে ।

চিভা-য় আমরা কয়েকদিনের জন্তু হাঁক ছাড়ার সময় পেলাম

রেললাইনের গোলমালের জন্তু পাঁচ দিনের বিরতি

আমরা সেই বিরতি কাটালাম ইয়ানকলেভিচ মশায়ের বাড়িতে যিনি তাঁর

একমাত্র মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছিলেন

তারপর আবার ট্রেন ছাড়ল

আমিই এবার পিয়ানোর বসলাম আর আমার দাঁত কনকন করছিল

ভাবলেই দেখতে পাই এমন স্তব্ধ সেই অন্তঃপুর বাবার দোকান

আর মেয়ের চোখদুটি যে মেয়ে রাতে আমার বিছানায় আসত
মুসোর্গাক্সি

আর ম্লগো ভোল্‌ক-এর লোকগীতি

আর গোবি-মরুভূমির বাতাস

আর বাইলার-এ মালবাহী সাদা উটের একটা সারি

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৫০০ কিলোমিটারের বেশি পথ ধরে আমি মদের বোরে
ছিলাম

আমি পিয়ানোর বসেছিলাম আর এটাই শুধু আমি দেখেছিলাম

যুরে বেডানোর সময় উচিত চোখ দুটো বুজে ধাকা

মুনো

পারলে আমি কত যে মুনোতাম

চোখ বুজে গন্ধ শুঁকে সবকটা দেশ আমি চিনে নিতে পারি

আওয়াজ শুনেই আমি সবকটা ট্রেন চিনে নিতে পারি

ইয়োরোপের ট্রেনগুলির গতি চার তালের আবার এশিয়ার ট্রেনগুলো

পাঁচ বা সাত তালের

অন্তগুলি হোল মুনপাড়ানি গান যায় চুপিসাড়ে

আর এমন কিছু ট্রেন আছে যারা চাকার একষেয়ে আওয়াজে আমার

মেতেরল'য়াক-এর অনড় গছের কথা মনে করিয়ে দেয়

চাকার আবোলতাবোল সমস্ত রচনারই আমি পাঠোদ্ধার করেছি

এবং রক্ত সৌন্দর্যের ছড়িয়ে থাকা উপাদানগুলি

আমি জড়ো করেছি

সেগুলি আমার কাছে রয়েছে

আর সেগুলি আমার ওপর ভর করে আছে।

জিজিকা আর ধারবিন

তার বেশি দূরে আমি বাইনা

এই শেষ স্টেশন

ধারবিন-এ আমি নেমে পড়লাম যেন কেউ রেড-ক্রশের
অকিসে এইমাত্র আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেল।

ওগো প্যারিস

বিপুল অগ্নিকুণ্ড যাতে তোমার রাস্তাগুলির জ্বলন্ত যত

চেলাকাঠ আড়াআড়ি রাখা আর সঙ্গে আছে তোমার পুরনো

বাড়িগুলি যারা ওপর থেকে ছুয়ে আছে আর গা গরম করছে

ঠাকুরা-দিদিমাদের মত

আর ঐ যে পোস্টারগুলি, লাল সবুজ রঙচঙে আমার সংক্ষিপ্ত অতীত যেমন
হলুদ

হলুদ বিদেশে ক্রান্তের উপজ্ঞাসের গর্বিত রঙ

বড় বড় শহরে চলন্ত বাসে গা ঘষতে আমার ভালো লাগে

স্যা-জের্ম্যা-মোঁমাত্র' রুটের বাসগুলো আমাকে মোঁমাত্র' পাহাড়ের

সামনে নিয়ে যায়

মোটরগুলি সোনার বাঁড়ের মত ডাক ছাড়ে

গোধূলির গোরুগুলি সাক্রে-ক্যর-এর ডাল ভেঙে খায়

ওগো প্যারিস

কেন্দ্রীয় স্টেশন যত সব বাসনাব ঘাট যত সব হুশিয়ার মোড়

শুধুমাত্র মনোহারী দোকানের দরজায় এখনো একটুখানি আলো রয়েছে

ইরোরোপীয় বিখ্যাত দ্রুতগামী ট্রেন ও ট্রেনে শয়ন-কামরার আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য-সংস্থা আমাকে তার প্রচারপুস্তিকা পাঠিয়েছে

ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গির্জা

আমার কিছু কিছু বন্ধু আমাকে পাঁচিল এর মত ঘিরে রাখে

ওদের ভয় কখন আমি চলে যাই আমি হয়ত আর ফিরব না

যেসব নারীর আমি দেখা পেয়েছি তারা সবাই দিগন্তে দিগন্তে

দাঁড়িয়ে পড়ে

কল্প ওদের অকল্পিত আর বুটের মধ্যে রাস্তার আলোকসজ্জার মতো

বিবল ওদের চাউনি

বেলা, অ্যাগনেস, ক্যাথরিন আর ইতালিতে আমার ছেলের মা

আর উনি, আমেরিকায় আমার প্রেরণীর মা

কিছু কিছু সাইরেনের আর্তনাদ আছে যা আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করে

ওখানে মাকুরিয়ার একটা পেট এখনো কেঁপে কেঁপে উঠছে গুসবের
সময় যেমন হয়

ভালো হোত

ভালো হোত যদি আমার এই ভ্রমণগুলি না করতাম

আজ রাতে এক দারুণ প্রেম আমার কষ্ট দিচ্ছে

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ক্রান্তির ছোট জেআনের কথা ভাবছি
বিশ্লতা ভরা এক সন্ধ্যায় তার সম্মানে এই কবিতা আমি লিখেছি
জান

বেঁটেখাটো বারবনিভা

আমার মন খারাপ আমার মন খারাপ

আমি ‘দুঃস্বপ্ন খরগোশ’ রেস্টোর’ায় যাবো আমার হারানো যৌবনকে
স্মরণ করতে

আর কয়েকটা ছোটপেগ মদ খেতে

তারপর আমি একা একা ফিরব

প্যারিস

নির্বাচন-চক্র ফাঁসিকাঠ আর একমাত্র টাওয়ারের নগরী

প্যারিস, ১৯১৩

পুঙ্খর দাশগুপ্ত

আকাশ আর নদুজের চেয়ে তুমি সুন্দর

যখন তুমি ভালোবাসো তখন উচিত বিদায় নেওয়া
ছেড়ে যাও তোমার স্বীকে ছেড়ে যাও তোমার বাচ্চাকে
ছেড়ে যাও তোমার বন্ধুকে ছেড়ে যাও তোমার বাচ্চবীকে
ছেড়ে যাও তোমার প্রেমিকাকে ছেড়ে যাও তোমার প্রেমিককে
যখন তুমি ভালোবাসো তখন উচিত বিদায় নেওয়া

জগৎসংসার নিগ্রো পুরুষ আর নিগ্রো রমণীতে ঠাসা
নারী পুরুষ পুরুষ নারী
তাকিয়ে দেখ সুন্দর দোকানগুলি
ঐ ছ্যাকডা গাড়ি ঐ পুরুষটি ঐ নারীটি ঐ ছ্যাকডা গাড়ি
আর যত সব সুন্দর পসবা

রয়েছে শূণ্য রয়েছে বাতাস
পর্বত জল আকাশ পৃথিবী
শিশুরা জীবজন্তু
গাছপালা আর পাখুরে কয়লা

বেচতে কিনতে ফের বেচতে শেখো
দাও নাও দাও নাও
যখন তুমি ভালোবাসো জানা উচিত
গান গাওয়া ছোট্ট খাওয়া পান করা
শিস দেওয়া
আর কাজ করতে শেখা

যখন তুমি ভালোবাসো তখন উচিত বিদায় নেওয়া
শ্মিত হাসি হাসতে হাসতে চোখের জল কেলো না
ছুটি স্তনের মাঝখানে বাসা বেঁধো না
নিঃশ্বাস নাও হাঁটো বিদায় নাও চলে যাও

আমি নান করি আর আমি তাকিয়ে থাকি

আমি দেখি আমার চেনা মুখখানি
হাত পা চোখ
আমি দ্বান করি আর ডাকিয়ে থাকি

গোটা জগৎটা চিরকাল রয়েছে
অবাক করা জিনিসে ভর্তি জীবন
ওষুধের দোকান থেকে আমি বেরোই
ওজন করার যন্ত্রের ওপর থেকে সন্ত নেমে আসি
আমি আমার ৮০ কিলো ওজনটা দেখে নিই
আমি তোমার ভালোবাসি

শুভর দাশগুপ্ত

চিঠি

তুমি আমার বলেছ আমার যদি চিঠি লেখো
সবটা টাইপ কোরো না
নিজের হাতে যোগ করে দিও একটা লাইন
একটা শব্দ কিছুই না আছা বিশেষ কিছুই নয়
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

তবুও আমার রেমিংটনটা স্থল্লর
ওটাকে আমি খুবই ভালোবাসি আর বেশ কাজ করি
আমার লেখা গোটা গোটা আর পরিষ্কার
দেখে বেশ বোঝা যায় আমিই তা টাইপ করেছি

কিছু শূন্যস্থান থাকে যা আমিই এক রাখতে জানি
 তাহলে আমার পৃষ্ঠার যে চোখ আছে তা দেখো
 তবু তোমার খুশি করার জন্য আমি কালিতে বোঁগ করে দিই
 দু'তিনটে শব্দ
 আর মোটা একটা কালির দাগ
 যাতে করে শব্দগুলো তুমি পড়তে না পারো ।

গুহর দাশগুপ্ত

লেখা

আমার টাইপমেশিনটা তালে তালে চলতে থাকে
 প্রতিটি পংক্তির শেষে সে বেজে ওঠে
 রোলাবের মাথার দাঁতওয়ালা চাকতিগুলি ঘরঘরু আওয়াজ তোলে
 মাঝে মাঝে আমি বেতের আরাম কেন্দ্রারান্ত্র এলিয়ে পড়ে
 একরাশ ঘোঁয়া ছাড়ি
 আমার সিগারেট সারাক্ষণ জ্বলতে থাকে
 আমি তখন চেউয়ের শব্দ শুনতে পাই
 বেসিনের পাইপে গলা টেপা জলের গরুগরু শব্দ
 আমি উঠে দাঁড়াই আর ঠাণ্ডা জলে আমার হাত ভিজিয়ে নিই
 কিংবা গায়ে আতর লাগাই
 লেখার সময় নিজেকে না দেখার জন্য কাচওয়ালা আলমারির
 আয়নাটা আমি ঢেকে দিয়েছি
 জাহাজের গোল কোকরটা একটা রোদের চাকতি
 যখন আমি চিন্তা করি
 সেটা তখন ঢোলের চামড়ার মত বেজে ওঠে আর জোরে জোরে কথা বলে

গুহর দাশগুপ্ত

আমি তো কথাটা বলেছিলাম

আমি কথাটা বলেছিলাম

বানর কিনতে গেলে

বেঙুলো বেশ ছটকটে আর তোমাদের প্রায়

ভয় পাইয়ে দেয় ওগুলোই নিতে হয়

আর তোমাদের বুকের ভেতর লেপ্টে থাকা মুমিয়ে পড়া শাস্তিষ্ট

কোন বানর কক্ষনো বাছতে নেই

কারণ ওগুলো আকিং খাওয়ানো বানর যারা পরদিন

হিংস্র হয়ে ওঠে

এটাই ঘটেছিল একটা কমবয়সী মেয়ের ও নাকে কামড় খেয়েছিল

পুঙ্কর দাশগুপ্ত

হাসা

আমি হাসছি

আমি হাসছি

তুমি হাসছো

আমরা হাসছি

এই হাসি বাধে কেবল আমাদের ভালোবাসা

আর কিছুই প্রয়োজন নেই

নির্বোধ আর খুশি হতে জানা চাই

পুঙ্কর দাশগুপ্ত

দীপ

দীপ

দীপ

দীপ যেখানে কেউ কোনদিন নৌকো ভেড়াবে না

দীপ যেখানে কেউ কোনদিন নামবে না

দীপ গাছপালার ঢাকা

দীপ বাঘের মতো ওঁৎ পেতে থাকা

দীপ নিস্তব্ধ

দীপ নিষয়

দীপ অবিস্মরণীয় আর পরিচয়হীন

জাহাজ থেকে আমার জুতোগুলি ছুঁড়ে দিই কেননা আমি

তোমাদের কাছে যেতে চাই

গুরুদাস দাশগুপ্ত

কেন আমি লিখি

কেননা—

গুরুদাস দাশগুপ্ত



২/২/১২ ————— হেনরি মিশো

অ'রি মিশোর কবিতা

POEMES DE HENRI MICHAUX

অঁরি মিশো

এক দূর দেশ থেকে আমি লিখছি

১

যেয়েটি জানায় : আমাদের এখানে মাসে মাত্র একবার সূর্য ওঠে, তাও অল্প সময়ের জন্তে। লোকে কিছুদিন আগেই চোখ রগড়ায়, কিন্তু বুখা। সময় একেবারে অনমনীয়। সূর্য তার যথানির্দিষ্ট মুহূর্তেই আসে।

অতঃপর, যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ করবার থাকে একগাদা কাজ, কলে নিজের দিকে একটু চেয়ে দেখবার অবসর পাওয়াই যায় না প্রায়।

রাত্তিরে আমাদের রান্নাটো বাধে যখন কাজ করতে হয়, কাজ তো করতেই হয় : তখন অনবরত বায়ন জন্মাতে থাকে।

২

তাকে যেয়েটি আরও বলে : পাড়াগাঁয় কেউ যখন হাঁটে তখন তার সামনে খাড়া হয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাউ। সেগুলো সব পাহাড়। শীগগির হোক আর ঘেরিতে হোক, হাঁটু মোড়া শুরু করতে হয়। প্রতিরোধে কোন ফল হয় না, আর অগ্রসর হওয়াই যায় না, এমনকি নিজেকে জখম ক'রেও।

আমি একথা আঘাত দেবার জন্তে বলছি না। আমি যদি সত্যি আঘাত দিতে চাইতাম তাহলে অল্প অনেক কিছুর বিষয়ে বলতে পারতাম।

৩

তাকে সে আরও জানায় : এখানকার ভোরবেলাটা ধূসর। এরকম বরাবর ছিল না। কাকে দোষ দেব জানিনা।

রাত্তিরে পোষা গোরুভেড়া জোর ডাকতে থাকে, সে-ডাক শেষের দিকে দীর্ঘ আর তীব্র হ'য়ে যায়। করুণা হয়, কিন্তু কি করা বাবে ?

ইউক্যালিপটাসের গন্ধ আমাদের ঘরে : মদল, প্রশান্তি ; কিন্তু তা সব কিছু থেকে বাঁচাতে পারে না, নাকি তুমি মনে করো তা সব কিছু থেকে সত্যি বাঁচাতে পারে ?

আমি আর একটা কথা যোগ করছি, বরং বলা যায় একটা প্রশ্ন।

তোমাদের দেশেও কি জল বয়? (তুমি আমাকে তা বলেছো কিনা আমার মনে নেই) এবং শিহরনও জাগায়, ঠিক সেই জলই কিনা।

আমি কি তাকে ভালোবাসি? জানি না। যখন সে শীতল থাকে তখন তার ভিতরে নিজেকে এমন একলা মনে হয় কিন্তু সে যখন উষ্ণ থাকে তখন সম্পূর্ণ অন্তর ব্যাপার। তাহলে? কি ক'রে বিচার করা যাবে? তোমরা যখন অকপটে মন খুলে তার সম্বন্ধে আলোচনা করো তখন কি করে বিচার করো আমরা বলো।

৫

আমি পৃথিবীর শেষ সীমা থেকে তোমায় লিখছি। তোমার তা জানা দরকার। গাছরা প্রায়ই কাঁপে। পাতাগুলো লোকে কুড়িয়ে নেয়। তাদের কত যে শিরা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাতে কি লাভ? গাছের সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না, ফলে আমরা বিব্রত হ'য়ে স'রে পড়ি।

পৃথিবীর জীবনযাত্রা কি হাওয়া ছাড়া চলে না? না কি সব কিছুকে কাঁপ-ভেই হবে সব সময়, সব সময়?

মাটির নিচেও নড়াচড়া আছে, আর বাড়ির মধ্যে আছে বৃষ্টি ক্রোধ, যা তোমার সামনে এগিয়ে আসে, যেন কড়া মেজাজের কেউ তোমার স্বীকারোক্তি আদায় করতে চায়।

যা না দেখলেও চলে তা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিছুই না। তবু সবাই কাঁপে। কেন?

৬

আমরা সবাই এখানে বাস করি দাক্ষিণ উষ্মের মধ্যে। জানো কি আমি যদিও এখন খুব অল্পবয়সী আগোঁআরও অল্পবয়সী ছিলাম। আমার সান্নিধ্যও তাই ছিল। এর মানে কি? নিশ্চয় এর তাৎপর্য ভয়ঙ্কর।

এবং আগে, যেমন তোমাকে ইতিপূর্বে বলেছি, আমরা যখন আরও অল্পবয়সী ছিলাম তখন আমাদের উয় করত। আমাদের বিভ্রান্তির সুযোগ নেওয়া হত। আমাদের হয়তো বলা হত : “এই তো, এখন তোমাদের কবর নেওয়া

হবে। তার সময় এসে গেছে।” আমরা ভাবতাম : “কথাটা সত্যি, আজ রাতেও আমাদের কবর দেওয়া হতে পারে, যদি বোঝা যায় তার সময় এসে গেছে।”

এবং আমরা বেশি দৌড়াতেও সাহস করতাম না : দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এক তৈরি-রাখা গছরের সামনে পৌঁছোনো এবং একটা কথা বলবারও সময় না থাকা, দম না থাকা।

বলো তো এ কথার রহস্যটা কি ?

৭

তাকে সে আরও জানায় : গাঁয়ে সব সময় সিংহদের দেখা যায়, তারা নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দিকে নজর না দিলে তারা আমাদের দিকে নজর দেয় না।

কিন্তু তাদের সামনে কোন তরুণীকে যদি দৌড়তে দেখে, তাহলে তারা তার বিহ্বলতা ক্ষমা করতে চায় না। না। তারা তক্ষুনি তাকে খেয়ে কেলে।

এই কারণে তাবা সব সময় গাঁয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে তাদের কিছু করবার নেই, কেননা তারা যে অন্ত্রও এমনি হাই তুলবে, এটা কি স্পষ্ট নয় ?

৮

তাকে সে একান্তে জানায় : বহু বহু কাল ধ’রে আমরা সমুদ্রের সঙ্গে বিতণ্ডা ক’রে আসছি।

খুব কচিং কখনো তার নীল রঙ এবং শান্ত ভাব দেখে তাকে খুশি মনে হয়। কিন্তু তা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তাছাড়া, তার গন্ধই তা ব’লে দেয়, এক পচা গন্ধ (অবিদ্রি তা তাব ভিক্ততাও হতে পারে)।

এখানে চেউয়ের ব্যাপারটা আমার ব্যাখ্যা করা উচিত। সে এক দারুণ জটিল ব্যাপার, এবং সমুদ্র...আমি তোমাকে অল্পরোধ করছি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি কি তোমাকে ঠকাতে চাইব ? সে শুধু একটা কথা নয়, শুধু একটা ভয় নয়। আমি তোমাকে শপথ ক’রে বলছি সে আছে ; তাকে লোকে দেখে সব সময়।

কে ? আমরা, আমরা তাকে দেখি। সে অনেক দূর থেকে আসে আমাদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধাবার জন্তে, আমাদের ভয় দেখাবার জন্তে।

তুমি বখন আসবে তখন নিজেই তাকে দেখতে পাবে, তুমি একেবারে অবাক হ'য়ে যাবে। “আরে !”—তুমি ব'লে উঠবে, কেননা সে বিমুঢ় করে দেয়।

আমরা একসঙ্গে তাকে দেখব। আমি নিশ্চিত যে, আমার আর ভয় করবে না। বলো, তা কি কখনো ঘটবে না ?

২

সে বলে যায় : কোন সন্দেহ, কোন অনাস্থা আমি তোমার মনে থাকতে দিতে পারি না। তোমাকে সমুদ্রের কথা আমি আবার বলতে চাই। কিন্তু বিমুঢ় হওয়ার অবস্থাটা রয়েইছে। শ্রোতৃস্বিনীগুলো এগোয় কিন্তু সে এগোয় না। শোনো, রাগ করো না, আমি শপথ ক'রে বলছি তোমাকে আমি ঠকাতে চাইছি না। সে ঐ রকমই। যতই উথালপাথাল সে ককক না কেন, অল্প একটু বালির সামনে সে থেমে পড়ে। তার মতো কেউ বিমুঢ় বোধ করে না। সে নিশ্চয় অগ্রসর হতে চায়, কিন্তু যা ঘটে তা ঐ।

পরে কোন দিন হয়তো সে এগোবে।

১০

তার চিঠিতে লেখা ; “পিঁপড়েরা আমাদের আগের চেয়ে আবও বেশি ঘেরাও ক'রে আছে।” তারা উদ্বিগ্নভাবে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে খুলো ঠেলে। আমাদের সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ তাদের নেই।

একটা পিঁপড়েও মাথা তোলে না।

সবচেয়ে বদ্ধ সমাজ ওদেব, যদিও ওরা অবিরাম বাইবে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে কিছু আসে যায় না, ওদের নানাপরিকল্পনা থাকে পূরণ করবার, একাগ্র-ভাবে নানা কাজ কবার থাকে...ওরা নিজেদের নিয়েই আছে...সর্বত্র।

এবং আজ পর্যন্ত একটিও আমাদের দিকে মাথা তোলেনি। বরং ওরা পিষ্ট হ'য়ে যাবে তাও সই।

১১

সে তাকে আরও লেখে :

“আকাশে যে কি সব আছে তা তুমি কল্পনা করতে পারো না, দেখলে

তবে বিশ্বাস হবে। যেমন, ধরো, ঐ...কিন্তু সেগুলোর নাম তোমাকে একুনি আমি বলব না।”

যদিও দেখলে মনে হয় সেগুলো খুব ভারী এবং প্রায় সারা আকাশটা জুড়ে আছে, তবু তাদের ওজন নেই যতই বড় হোক না কেন, নবজাত শিশু যেমন।

আমরা তাদের বলি মেঘ।

এটা সত্যি যে, তাদের ভিতর থেকে জল বেরোয়, কিন্তু তাদের চিপে নয়, চূর্ণ করে নয়। এত কম জল তাদের থাকে যে সেরকম করা বুখা।

কিন্তু অনেক অনেক দৈর্ঘ্য, অনেক অনেক প্রস্থ এবং গভীরতাও, অনেক গভীরতা জুড়ে যদি তারা থাকে এবং যদি ফুলতে ফাঁপতে পারে, তাহলে শেষ পর্যন্ত কয়েক ফোটা জল, ইঁা জল, তারা ঝরাতে পারে। এবং তাতেই লোকে একেবারে ভিজে যায়। তাদের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়ায় লোকে রেগে কাঁই হয়ে পালায়; কেননা তারা ঠিক কোন্ মুহূর্তে তাদের ফোটাগুলো ঝাবাবে কেউ জানে না; কখনো কখনো তারা দিনের পব দিন তাদের ফোটা ঝরায় না। বাড়ি ব’সে তার জন্তে অপেক্ষা করলে তা বুখা হবে।

১২

শিহরন সম্বন্ধে ভালোভাবে শিক্ষা এদেশে দেওয়া হয় না। আমরা আসল নিয়মকানুনগুলো জানি না, ফলে ঘটনাটা যখন ঘটে আমবা তার জন্তে মোটেই প্রস্তুত থাকি না।

ব্যাপাবটা হল সময়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। (তোমাদের দেশেও কি তা এইরকম?) তার আগেই এসে পৌছনো দরকার; বুঝেছো আমি কি বলতে চাইছি, সামান্য খুব সামান্য আগে। দেবাজের মধ্যে উকুনের গল্পটা কি তুমি জানো? ইঁা, নিশ্চয়। গল্পটা খুব সত্যি, তাই না? আমি আর কি বলব জানি না। কবে আমাদের দেখা হবে?

অরুণ মিত্র

পেশা

কাউকে না ঠেঙিয়ে বড় একটা তার দিকে তাকাতে পারি না। মনের
সঙ্গে দ্বন্দ্ব অনেকের পছন্দ : আমার ? কখনো না। আমি ঠেঙাতেই চাই।

রেষ্টোরাঁর কেউ কেউ আমার সামনে চুপচাপ বসে, কিছুক্ষণ থাকে,
কেননা তারা খেতেই এসেছে।

এই যে, একজন।

এই ওকে কজা করলাম ; থপ্।

এই ফের কজা করলাম, থপ্।

এইবার ওকে পোশাকের 'হক'-এ ঝোলালাম।

এবার হক থেকে নামালাম।

ফের ঝোলালাম।

আবার ওকে নামালাম।

টেবিলে রাখলাম, চটুকালাম, হাসরোধ করলাম।

কলঙ্কিত ক'রে জলে চোবালাম।

ও বেঁচে উঠলো।

ওকে সাফ্ করলাম, টেনে সোজা করলাম (ক্রমে উত্তেজিত হতে
লাগলাম এর তো একটা শেষ করতে হবে), ওকে দললাম, ওকে পিষলাম,
ওকে তাল পাকালাম আর গেলাসে ঢুকিয়ে দিলাম এবং বেশ জাঁকিয়ে
ভেতরের জিনিসটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেললাম, ছোকরাটাকে বললাম : “এর
চেয়ে একটা পল্লিকার গেলাস দাও তো।”

কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম, তাড়াতাড়ি হিসেব চুকিয়ে তাই সরে
পড়লাম।

বল্লভলাল দে

আমার রাজ্যিতে, আমার রাজ্যকে আমি অবরুদ্ধ করি, আমি ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াই ও তাঁর ঘাড়টা মটকাই।

উনি শক্তি সঞ্চয় করেন, আমি ফিরে আসি ওঁর উপর পড়তে, এবং আরো একবার ওঁর ঘাড়টা মটকাই।

ওঁকে ধরে নাড়া দিই, জোরে-জোরে ওঁকে নাড়াই কোনো বৃদ্ধ ভদ্রুর লতার মতো, ওঁর মাথায় মুকুটটা কাঁপতে থাকে।

তবু, উনি আমার রাজ্য, যেটা আমি জানি এবং উনি নিজেও জানেন, এবং আমি ওঁর আজ্ঞাধীনই, নিশ্চয়।

তা সত্ত্বেও, রাজ্যিতে, আমার দুই হাতের আবেগ ওঁর টুটি টিপে ধবে অবিরাম। একটুও ভীত নই, চুকি খালি হাতে, এবং ওঁর সেই রাজকীয় ঘাড়েরো চোঁচড় দিই।

এবং উনি আমার রাজ্য, যাব টুটিটা আমার ছোট ঘরের নিভূতে আমি কত-না দিন ধরে বুথাই টিপে ধবাছি; ওঁর মুখটা প্রথমে ফেকাসে হয়, অল্প পরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, এবং উনি মাথাটা তোলেন আবার, প্রতি রাজ্যে, প্রতি বাদ্বেই।

আমার ছোট ঘরের নিভূতে, আমার রাজ্যের সেই মুগে আমি পানি। পরে হাসিতে ফেটে পড়ি। উনি চেঁচা করেন কপালের সৌম্য ভাবটা বজায় রাখতে, সব অপমান থেকে মুক্ত থাকতে। কিন্তু, শুধু যখন ওঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াই, একমাত্র তখন ছাড়া আমি সমানে পেদেই চলি ওঁর মুখে, এবং হাসিতে ফেটে পড়তে থাকি, ওঁর সেই সম্ভ্রান্ত বদনের সামনে, যখন উনিও চেঁচা চালিয়ে যান নিজের মহিমাটা অক্ষুণ্ণ রাখতে।

এইভাবেই ওঁর সঙ্গে চলে আমার ব্যবহার; আমার অখ্যাত জীবনে সেই এক অস্বস্তিই আরম্ভ।

এবং এবার এই ওঁকে মাটিতে ফেলে দিলাম, পরে চেপে বসছি ওঁর মুখের উপর—ওঁর মহামহিম মুখখানি ঢাকা পড়ে যায়। তখন তেলের দাগধরা আমার অভব্য প্যান্টটা, এবং আমার পাছটা—যেহেতু জায়গাটার নামটাই এই—এ-দুটো থামা বসে থাকে ঐ যে-মুখ তৈরি হয়েছে রাজত্ব করার জন্য, সেই মুখখানির উপর।

এবং যখন খুলিমতো বা খুলিরও বাইরে বাঁয়ে-ডাইনে ঘুরতে-কিরতে এতটুকু অস্বস্তি-বোধ নেই আমার, একেবারেই নেই, তখন একবার ভুলেও ভাবি না গুঁর নাক বা চোখ-ছটোর কথা বা হয়তো পড়ে যেতে পারে আমার পথে। বসে থাকতে-থাকতে অকস্মিৎ যখন ধবে, একমাত্র তখনই আমি উঠে বেরিয়ে যাই।

আর কিবি যদি, দেখি গুব অবচল মুখশানি সমানই বিরাজমান, সবসময়।

ঠেকে চড় মাঝি, ধান্ড কয়ই, পরে বিজ্ঞপের ভাবে বাচ্চা ছেলের মতো গুঁর নাকটা ধবে ঝেড়ে দিই।

অবশ্য এত সব্বেও এটা পরিষ্কার যে উনিই হলেন রাজা, এবং আমি গুব প্রজা, গুব সবধন-নীলমণি প্রজা।

পৌদে লাখি মেবে গুঁকে আমার ঘব থেকে তাড়াই। গুঁকে ঢাকি কুটনোর পোশায়, আবর্জনায়ে। গুঁর ঠ্যাঙে আছাড় মেবে বাসন ভাঙি। গুঁর কান-ছটো ভরে তুলি জ্বজ্ঞ চোপা-চোপা অপমানের বুলিতে, যাতে গুঁকে অবশেষে নাভাতে পারি যেমন গভীরভাবে তের্মনি লজ্জায়—ছমুঁখদের সেবার যোগ্য সেই কুৎসার সারি, যত নোংরা তত লম্বা তার খুঁটিনাটিতে, যাকে উচ্চারণ কবা মানেই এমন এক জঞ্জালে পড়া যার পেকে রেহাই আর নেই, শরীরেব মাপে তৈবী সেই কদাকার জামা : অস্থিত্বের মলমুত্রই বটে।

যাই হোক, পরদিন আমায় কের স্নক কবতে হয়।

উনি কিবে এসেছেন, ঐ রয়েছেন। সবসময় বসেছেন। পিটুটান যে দেবেন চিরকালের মতো, তা সম্ভব নয় গুঁর পক্ষে। না, এইটুকু এই ঘবে গুব ঐ হতচ্ছাড়া রাজকীয় উপস্থিতিটা আমাব ঘাড়ে না চাপালেই গুঁর নয়।

মামলা-মকদ্দমায় আমায় প্রায়ই জড়িয়ে পড়তে হয়। টাকা ধার করি, বা ঝগড়ার সময় ছোরা বার করে বসলাম, কি ছোট ছেলেপিলে দেখলাম তো তাদের ওপর অত্যাচার করলাম—কি কবি, নাচার আমি—আইনের মাথামুতু আমার বোঝা হল না।

প্রতিপক্ষ যখন আদালতে তার নালিশ যথাযথ পেশ করেছে, আমার যুক্তিতে কান না দিয়ে রাজা আমার সেই প্রতিপক্ষেরই ওকালতি সমর্থন করতে বসেন, যেটা তাঁর ঐ মহামহিম মুখে হয়ে দাঁড়ায় অভিশংসনই, যে-রান আমার ঘাড়ে পড়ল বলে, তারই ভরাবহ গৌরচন্দ্রিকা।

শুধু শেষের দিকে, কয়েকটি তুচ্ছ সীমা তিনি বেঁধে দিলেন।

প্রতিপক্ষ যখন দেখে, এ সীমার তার কিছু স্বার্থ-আসে না এবং ব্যাপার-টাতে আদালতেরও স্বার্থ নেই, সে তখন তার নালিশের ঐ গোণ অংশগুলি প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত—বাকী অংশগুলিতে তো সে সমর্থন পাচ্ছে, তাই তার যথেষ্ট।

এমন সময় বাজা আমার আবার গোড়া থেকে শুরু করলেন তাঁর যুক্তি-প্রদর্শন, সবসময় ভাবটা যেন এটা পুরোপুরি তাঁর নিজেরই যুক্তি, শুধু সামান্য ছাঁট-কাট দিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত করলেন তাঁর বক্তব্য। যেই শেষ হয়েছে, পদে-পদে যুক্তির ঐকা প্রতিষ্ঠিত কবেছেন, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার শুরু করলেন তিনি একই বিচার, গোড়া থেকেই, এবং এইভাবে এক বার হতে অন্য বাবে তাঁর সেই বিচাবকে পবে-পবে একটু-একটু খর্ব করতে-করতে শেষে এমন অর্থহীনতায় পধবসিত করে ছাড়লেন যে লজ্জায় অধোবদন আদালত ও দর-ভর্তি বিচারকদের সেই দল ভাবতে শুরু করল হেন তুচ্ছ ব্যাপারে কী করে তারা আহত হতে পারে, এবং তাই উপস্থিত সকলের হাসি-ঠাট্টা-টিটকিবিব মধ্যে এক নাস্তিবাচক বায়ু দেওয়া হল।

পরে আমার কথা এতটুকু না ভেবে, যেন এ-ব্যাপারে আমি ধর্ডব্যোব মধ্যেই নেই এমন ভাব দেখিয়ে, বাজা আমার উঠে দাঁড়ালেন ও বেরিয়ে চলে গেলেন, তাঁর মুখ দেখে কাঁব সাধা বোঝে কী ভাবছেন তিনি!

এমন কর্ম কি কোনো রাজ্যই সাজে, এ-প্রশ্ন কবা চলে; যদিও এব দ্বাবাই তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন আসলে তিনি কী—এক ঘেচ্চাচাবী উংপৌডকই, যিনি নিজের নিদাক্ষ মন্ত্রবলের অমোঘ ও বিশ-মণী চাপটাকে শুধু জাহির করবেন, এবং সেটা ভিন্ন কিছুই, একেবারে কিছুই কাউকে করতে দেবেন না।

গাধার হৃদ আমি, ভাবছিলাম ঠুকে বাড় ধরে বার করে দেব! ঠুকে নিয়ে মাথাটা না ঘামিয়ে ধরে ঠুকে চূপচাপ, শুধু নিজের খুশীমতো চূপচাপ ছেড়ে দিলাম না কেন!

না, তা তো হবার নয়। গাধা যে আমি, এবং যে-মুহূর্তে উনিও দেখলেন বা রে, রাজত্ব করা এত সোজা, অমনি গোটা দেশটার উপরই তাঁর যথেষ্ট প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলেন।

যেখানেই যান, উনি গ্যাট হয়ে বসেন।

এবং লোকে এতটুকু আশ্চর্য হয় না, যেন ঠুর ঐ স্থানটি নির্দিষ্ট ছিল

চিরকাল ধরে।

কেউ রা'টি কাড়ে না আর, সকলেই কাল শুনছে—সকলেরই অপেক্ষা, এখন সিদ্ধান্ত যা-কিছু, তা উনিই নেবেন।

আমাব ছোট ঘরে আসে যায় জন্তু জানোয়ার। সব একসঙ্গে নয়। সব অবিকলও নয়। তবু তারা আসছে-যাচ্ছে, প্রকৃতির নানান আকারের এক হীন দশার ও হাস্যকর মিছিল। ঐ ঢুকছে সিংহ, মাথা নিচু, জীর্ণ কাপড়ের বস্তার মতো সারাটা গা কুঞ্চিত, এখানে-ওখানে ঠোঁকব খাওয়া। ওর খাবাগুলো দেখে কষ্ট হয়, যেন হাওয়ায় ভাসছে। কী কবে সে এগোচ্ছে কে জানে কিন্তু এগোচ্ছে হতভাগ্যেরই মতো।

হাতী যেটা ঢুকছে, সেটাও যেন চুপসে গেছে, বাচ্চা হবিণের থেকেও জোর তার কম।

এইরকমই অগ্ন্যস্ত্র জন্তুরা।

কোনো কল নয়, যন্ত্রপাতি নয়। মোটরগাড়ি ঢুকছে, তাও শুধু নৃশ্বর পাত একখানি, যা দিয়ে বড় জোং তক্তাব মেঝে বানানো যায়।

এমনই আমাব ছোট ঘরখানি, যেখানে আমার গোয়ার রাজামশাই হেন কোনো জিনিসই কিছুতে কখনো চাইবেন না যা তিনি নিজে ভুল পণে না চালিয়েছেন বা গোল পাকিয়ে না ছেড়েছেন বা শূন্যতায় পথবসিত না করেছেন, তবু সেই একই যে-ঘরে সঙ্গী হিসেবে পাওয়াব জন্তু আমি ডাক দিয়েছি কতনা প্রাণীদের।

এমন-কি বর্বরের চূড়ান্ত যে-গণ্ডাব, যে মানুষ সহ কবতে পারে না, শু'তো মেরে সটাং হাজির হয় যে-কোনো জায়গায় (আর কী কঠিন গা, একেবারে পাথরে বোদিত), সেই গণ্ডার পর্বন্ত একদিন প্রায় স্পর্শাতীত এক কুয়াশার মতো ঢুকে পড়ে, পালাতে ব্যস্ত, শরীবে জোর নেই...এবং হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

ওর চেয়ে একশো গুণ বেশি শক্ত ছিল গবাক্ষের পুঁচকে পর্দাটি—একশো গুণ বেশি শক্ত ঐ প্রবল প্রচণ্ড গণ্ডারের চেয়েও, যে নাকি যা-কিছুরই সামনে পড়ুক, কখনো পিছিয়ে আসে না।

কিন্তু গণ্ডার যদি ঢোকে তো ঢুকবে একমাত্র দুর্বল হয়েই, জলের ক্ষীণ টপ-

পট ফোটার মতো, এইরকমই চেয়েছেন আমার রাজা।

ওকে হয়তো হাঁটার জন্তু ভবিষ্যতে একদিন খঞ্জের যষ্টিই দেবেন...এবং ওকে বাগে আনতে চর্খের মতো কোনো বস্তুও, ছোট ছেলের এক পাতলা গায়ের চামড়া, যা ছুড়ে যাবে বালুকণার ঘটানিতে।

জন্তু-জানোয়ার যা-কিছু যাবে আমাদের সামনে দিয়ে, তারা একমাত্র এইভাবেই যাবে অগ্র কোনো ভাবে নয়, এমনই হুকুম আমার রাজার।

প্রভু উনি ; আমি ওর হাতের মুঠোয় ; মজা কববেন, এমন প্রবৃত্তি তাঁর নেই।

এই ছোট্ট শক্ত হাতটুকু আমার পকেটে, এ ছাড়া আমার সেই বাগ্দস্তা প্রিয়ার আব কিছুই নেই আমার কাছে।

ছোট্ট হাতটি খটপটে শুকনো ৬ মমিতে পবিণত (এ ছিল সত্যিই সেই প্রিয়ারই হাত একদিন, এও কি সম্ভব ?)। আমার সেই প্রিয়ার আর কিছুই রাপতে দেননি রাজা।

তাকে উনি কেড়ে নিয়েছেন। ঠুঁই জন্তু আমি হারিয়েছি তাকে। উনি তাকেও আজ আমার কাছে শূণ্যতায় পর্ষবসিত করে ছেড়েছেন।

আমার ছোট ঘবে, প্রাসাদের একটাব-পর একটা এই অধিবেশনগুলো দুর্দশারই অবশেষ।

সাপগুলো পর্ষন্ত ঠুঁই পক্ষে যথেষ্ট নিচু নয়, যেমনটি উনি চান তেমন হামা-গুডি দিয়ে তাবা গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে না, এমন-কি পাইন গাছ একটা, যা নড়ে না চড়ে না, তাও ঠুঁকে চট্টে ছাড়বে।

তাই যা-কিছু এসে হাজির হয় তাঁর দরবারে (আমাদের এই নগণ্য ছোট্ট ঘরে !), তাই সবই এত অবিশ্বাস্যভাবে হতাশাব্যঞ্জক যে ছোটলোকের থেকেও ছোটলোক তাকে নিয়ে কখনো ঈর্ষান্বিত হবে না।

তাছাড়া এক ঐ আমার বাজা ও এসবে অভ্যস্ত এই আমি ছাড়া আর কে এমন কোথায় আছে যে খুঁজে পাবে প্রাণীর মতো কোনো প্রাণী একটা, এই একের-পর-এক অধ্যাত পদার্থের ক্রমাগত এগোনো ও পিছু হটায়, বরা পাতার এই তুচ্ছ তিডিং-বিডিং নাচে, জলের এই দুটি একটি ফোটা যা নীরবতার বুকে পড়ে যেমন কঠিন তেমনি বিষন্নভাবে।

এসব অবশ্য ব্যর্থ প্রত্যাশাই বই নয় !
অবোধ্য তাঁর মূখের গতিবিধি, সত্যিই অবোধ্য ।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

এইগোঁরা
বীতিনীতি

জানালা ওরা ভালবাসে না, তাতে স্পষ্ট না দেখা গেল তো না-ই গেল, অস্তিত্ব নিজের বাড়িতে নিজের মতন করে থাকতে তো পারবে। কিন্তু যেহেতু তারা অতীব ভদ্র এবং আচরণও কবতে চায় জানালা ব্যবহারে অভ্যস্ত দেশের লোকেদেরই মতো—তাছাড়া জানালা না থাকলে পাছে ঘরটা গ্রাংটো-গ্রাংটো দেখায়, বা একধেয়ে ঠেকে কিংবা মনে হয় যেন রেগে-মেগে রয়েছে, ও তাই অথবা পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, এর-ওর যা-তা ভাবা, এদিকে নিজেরা যখন এবা শাস্তি ও সৌম্যতার প্রতিশ্রুতি বই নয়—তাই এরাও বাড়িতে জানালা বেখেছে, এমন-কি অতিরিক্ত ভাবেই রেখেছে। কিন্তু সব জানালাই আসলে কপট, খোলা একটিও যাবে না, এমন-কি আগুন লাগলে টপকে পালানোর উপায় পর্যন্ত নেই। তবু মিথ্যা হয়েও ছায়াতে-প্রতিচ্ছায়াতে অম্লকরণটি এত নিখুঁত যে সেই জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই আনন্দ, ওগুলি সত্য নয় জেনেও, বিশেষত যদি দিনের সময়টা আর রোদের জোরটা মোটামুটি মিলতে পারে ভ্রমটাকে যথার্থ জাঁকতে।

রয়েছে এমন-কি আধ-খোলা কত জানালাও, ঐ অবস্থায় চিরকাল ধরে, রাজি-দিন, তা কনকনে শীতে হোক কি কুয়াশায় হোক, বা বর্ষায় কি প্রবল ভূষার-পাতেই হোক, কেবল তা দিয়ে কিছু না পারে ঢুকতে না পারে বেরোতে, অনেকটা যেন ধনীদের ওপর-ওপর বদান্ততার ক্রুর অম্লরূপ।

সত্যিকারের জানালা যা কোনদিন খুলতে পারে, তার চিন্তাভেঁই এদের গা হুলিয়ে ওঠে। সেটা ভাবা মানেই যেন ঐ বুঝি ডিঙাল কেউ রেলিং, ঢুকে পড়ল ঘরে, এবং তখন আর ঠেকানো যাচ্ছে না এমন রবাহুতদের সারিয় ছবি বনিয়ে ওঠে ওদের ভীত-বিহ্বল চোখে।

আক্রান্ত হলে বহু শাস্তিশিষ্ট ব্যক্তিও যেমন হিংসাত্মক ও মন্দ হয়ে ওঠে,

তেমনি জানালায় কথা এদের কাছে পেড়েছে কি সর্বনাশ, এবং খোলা যায় এমন একটিও জানালা যদি তোমাদের থাকে তো নিজদের বাড়িতে এদের কাউকে ভুলেও তোমরা ডাকতে যেও না, তা সে-জানালা তোমাদের বন্ধই থাকুক, কোনো বাথার চাপে আটকানো থাক, বা বাবহারের অযোগ্য হোক, কিংবা হোক-না সে-জানালা কোন গুদাম-ঘরেরই। এমন কিছু করে যদি বসে তো এদের কেউই তোমাদের কখনো ক্ষমা করবে না।

লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়

গোররায়

ওরা ধর্ম-পিপাসু। ধর্মের জন্তু কী ত্যাগ স্বীকার না তারা করেছে? বর্বর আচার অনুযায়ী তারা খাবার রান্না করে না। কেবলমাত্র দেবতাদের ভাগ্যে জ্বোটে বান্না-কবা খাত। এ খাত তাবা বানায় খুব যত্ন করে। একজন পাকা রাঁধুনি সর্বক্ষণ আস্ত ভেড়া, হাঁস, প্রভৃতি সেদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত থাকে।

গোরদের দরাজ দিল (যদিও হয়ত কেবল ভয়ের খাতিরে), তারা অন্ত-দের অহুভূতিহীনতা বা কৃপণতা বুঝতে পারে না। তাবা কোনো বিদেশী যাত্রীকে বলবে, “সে কি! তোমার চারটি সন্তান আছে, আর তুমি তার দুটিকেও এমন শক্তিশালী দেবতাকে দিতে পারছ না!” (দেবতা কাম্বলকে)। এই অধর্ম তাদের হতভম্ব করে। তাদের মনে জেগে ওঠে ক্রোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ আর অনাচারের শাস্তি দিতে তারা এই সব দেবদ্রোহীদের বলি দেয় তাদের ক্ষুধিত দেবতাদের কাছে। (আমি বিশেষ ভাবে পরামর্শ দেব, এ দেশে একলা ভ্রমণ কর্তে, সঙ্গে যেন থাকে কেবল খুব অল্প মালপত্র যা দরকার হলে কোনো গর্তে লুকিয়ে ফেলা যায়।)...

...এই দেবতার নাম “সহজ”, ইনি রক্ত, বা জীবন, বা খাতবস্ত্রতে ভূষ্ট হন না। ইনি চান একমাত্র প্রিয়জন।

যখন ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এমন কোন পিতা পথের শেষে দেখা দেয়, তখনই দেবতার চোখ জলে ওঠে। হায়! বোঝা যায়, তিনি কি চান, বোঝা যায় তিনি সমঝদার।

সুদেষ্কা চক্রবর্তী-খাসনবিশ

অনন্তকাল ধরে, নোনেরা অলিয়াবেরদের দাস। অলিয়াবেররা তাদের দিয়ে সাধের অতীত কাজ করায়। কারণ তারা ভয় পাষ, নোনেরা একটু শক্তি ফিরে পেলে সুযোগ বুঝে নিজেদের দেশে ফিরে যাবে। অবশ্য সে দেশ প্রায় সম্পূর্ণ উবর, আর অংশত জলেব নিচে।

অত্যাচারের কালে নোনে জাতিব সংখ্যা অর্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই অলিয়াবেররা বাধ্য হয়, তাদের শিকার করা ব জন্ত তাদের দেশে আগের চেয়ে অনেক বেশি দূরে এগিয়ে যেতে। তাদের যেতে হয় জলাভূমি পষষ্ঠ, যেখানে হয়ত নোনেরা পালাতে পারত, যদি না শিক্ষিত কুকুব নিয়ে তাদের তাড়া করা হত।

চিরকাল এই অভিযানগুলি ছিল এক জাতীয় উৎসব। সমস্ত বড় অলিয়াবের কবি এ নিয়ে গান বেঁধেছেন। কিন্তু হাষ! ধবে আনা নোনেদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসছে। যে পরিমাণ সামরিক প্রস্তুতি করা হয়, তার তুলনায় এইটুকু লাভ অকিঞ্চিৎকর। আব এর জন্ত সেনাপতিরা দায়ী নন।

তাই আজকাল সরকারেব তত্ত্বাবধানে, পুরুষ ও মেয়ে নোনেদের জন্ত সংরক্ষিত এলাকা করা হয়েছে। সেখানে তাবা ধংস হতে অনিচ্ছুক, স্বাভাবিক জাতিব মত প্রচুর বংশবৃদ্ধি করার সুবিধা ভোগ করে।

নোনে বালক-বালিকাদের শত্রু-সমর্থ হয়ে ঠঠার বয়স হলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় আভিদ্রু প্রদেশে। সেখানে অলিয়াবেররা তাদের শিকার করতে আসতে পারে।...

কিন্তু নোনেরা ধৈর্য ধরে থাকে। তাবা বলে, ভগবান এ জিনিস চিরকাল সহ্য করবেন না, তিনি তাঁর ঠিক সময়ের অপেক্ষা করছেন।

বলাবাহুল্য, তিনি অপেক্ষা করছেন।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-খাসনবিশ

মহত্ত্ব, বস্তুর নীতির গতি পরখ করা হয় ; সেখানেই নাক ডাকা ; হাতে আছে সবটা সময় ; ধীরেস্থির, সারাটা জীবন। ধনিগুলোকে গিলে ফেলা হয়, ওদের গেলা হয় ধীরেস্থির ; সারাটা জীবন। নিজের জুতোর ভেতর জীবন কাটানো। সেখানেই গৃহস্থালি। জড়োসড়ো হয়ে থাকার আর দরকার নেই। হাতে আছে সবটা সময়। চেপে দেয়া। নিজের মুঠোব মধ্যে হাসা। যা জানা তা আর বিশ্বাস করা যায় না। গোনাব আর দরকার থাকে না। মদ খেতে খেতে সুখী ; মদ না পেতে পেতে সুখী ; মুক্কা তৈরি করা। অস্তিত্ব আছে, হাতে আছে সময়। এই হোল মহত্ত্ব। দমকা হাওয়া থেকে নির্গত। কাঠের জুতোর শ্বিঙহাসি। আর ক্লাস্ত নয়। আর অভিভূত নয়। পায়ের ডগায় ঝাঁটু। ঢাকনাব নিচে আর লজ্জা নেই। উন্নতির শিখরগুলো বেচে দেওয়া হয়েছে। নিজের সম্ভাবনাটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, স্নায়ুগুলোকে স্বস্তি দেওয়া হয়েছে।

কেউ একজন বলে। কেউ একজন আর ক্লাস্ত নয়। কেউ একজন আর শোনে না। কেউ একজনের সাহায্যের আর দরকার নেই। কেউ একজন উত্তেজনার আর টান টান হয়ে নেই। কেউ একজন আর অপেক্ষা করে না। একজন চোঁচায়। আবেক বাবা। কেউ একজন গডায়, ধুমোয়, সেলাই কবে, সে কি তুমি নরেন্দ্র ?

আর পাবে না, আর কিছুতেই নেই, কেউ একজন।

কিছু একটা কেউ একজনকে জোর কবে।

সুখ, কিংবা চাঁদ, কিংবা অরণ্য, কিংবা পশুর পাল, লোকজনের ভীড় কিংবা শহর, কেউ একজন তার সহযাত্রীদের ভালবাসে না। বেছে নেয়নি, চিনতে পারে না, পরখ করে না।

ভাঁটার রাগী তার বাবা আলাগা করে দিয়েছে ; বোঝার আর সাহস নেই ; যথার্থ হওয়ার আর অভিলাষ নেই।

...আর প্রতিরোধ করে না। কড়িকাঠগুলো কাঁপে আর সে তোমরা।
আকাশ কালো আর সে তোমরা। কাঁচ ভেঙে যায় আর সে তোমরা।

মাল্লবের গোপনীর ব্যাপারটা হারিয়ে গেছে।

তারা “উন্মত্ত” নাটক করে। ছোকরা এক চাকর বলে “জ্যা” আর একটা
ভেড়া তার সামনে একটা রেকাবি উপস্থিত করে। অবসাদ! অবসাদ!
চারদিকে ঠাণ্ডা!

হার! আমার বারো বছরের গোছা গোছা ডালপালা, এখন তোমরা
কোথায় মড মড করছ?

নিজের কোটব রয়েছে অন্ত কোথাও।

ছায়াকে নিজের জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অবসাদে, আবর্তনের
ঝোঁকে। দুবে বিশালাকৃতি ফুল আসলেপিয়াব-এর গুঞ্জরণ শোনা যায়।

...অথবা সহসা একটি কণ্ঠস্বর তোমার হৃদয়ে আর্তনাদ করে উঠতে
উপস্থিত হয়।

নিজের হারিয়ে যাওয়াবাদের জড়ো করা হয়, এসো, এসো।

দিগন্তে নিজের চাবি খোঁজার সময় দম-আটকানো জলে যে মারা গেছে
সেই জলে ভোবানো নারী গলা জড়িয়ে থাকে।

সে গড়িমসি করে। এমন সে গড়িমসি করে! সে আমাদের হুঁতাবনার
তোষালা করে না। তার বড বেশি হতাশা। সে শুধু তার যন্ত্রণার কাছেই
আত্মসমর্পণ করে। হাব, হুতোগ, হায়, শহীদ হওয়ার যন্ত্রণা, নিমজ্জিতা নারীর
বিরামহীন আলিঙ্গনে আবদ্ধ কণ্ঠ।

পৃথিবীর বক্তৃতা অমূল্যব করা যায়। এখন থেকে এমন চুল থাকবে যাতে
শুভাবতই ঢেউ বেলে যাবে। মাটির সঙ্গে আর বেইমানি করা হয় না,

আবলেত যাচ্ছে সঙ্গে আর বেইমানি করা হয় না, জল আর পাতার সম্পর্কে
বোন। নিজের চোখের আর দৃষ্টি নেই, নিজের বাহর আর করতল নেই।
আর ব্যর্থ নয়। আর কোন ঈর্ষা নেই। কেউ আর ঈর্ষা করে না।

আর কাজ করা হয় না। ঐ যে বোনা জামা, তৈরি, সব জায়গায়।

নিজের শেব পাতায় সই হচ্ছে গেছে, এবার প্রজাপতিদের বিদায়।

আর স্বপ্ন দেখা হয় না। স্বপ্নে দেখা হয়। স্তব্ধতা।

জানবার আর কোনো তাড়া নেই।

বিস্তারের কণ্ঠ নথ আর হাড়ের সঙ্গে কথা বলে।

অবশেষে স্বস্থানে, স্তব্ধতায়, মাধুর্যে বর্ষায় বিদ্ধ।

চোখের ভেতর টেউগুলোর দিকে তাকানো হয়। তারা আর ভোলাতে
পারে না। হতাশ হয়ে, তারা সরে যায়, জাহাজের গা থেকে। জানা আছে,
জানা আছে, কিভাবে তাদের আদর করতে হয়। জানা আছে তাদের লজ্জা
আছে, তাদেরও।

কি পরিশ্রান্ত দেখায় তাদের, তাদের দেখাব কি অসহায়!

মেষ থেকে নেমে আসে একটা গোলাপ আর নিজেকে নিবেদন করে তীর্থ-
যাত্রীর কাছে; মাঝে মাঝে, কদাচিৎ, এমন কদাচিৎ। ঝাড়-লষ্ঠনের শ্যাওলা
নেই, নেই সাংগীতিক ললাট।

আভঙ্ক! উদ্দেশ্যহীন আভঙ্ক!

নিরুত্ত বেড়ে ওঠা ধাপ আর গুহা।

স্বর্গ ও মর্তের টুকরো, অনিচ্ছায়, অকারণে গিলে ফেলা সংসার, আর শুধু
গেলার জন্তেই।

রাতের জলে ঝাকা দীপ আমার কথা শোনে। সে বলে, “তুমি বলেছ, তুমি সস্তা কথাটাই বলেছ, তোমার এটাই আমি ভালোবাসি।” এগুলোই হল দীপের যথার্থ কথা।

আমাকে ফাঁপা ছড়ির ভেতরে সঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী শোধ নিল। আমাকে ফাঁপা ছড়ির ভেতরে সঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ইনজেকশনের ছুঁচের ভেতরে। যেখানে দেখা করার কথা সেই স্থানলোকে আমি পৌছাই এটা ছিল অবাস্তব।

আর আমি ভেবেছিলাম, “বেবিষে পড়ব? বেরিষে পড়ব? নাকি কখনোই নেবোব না? কখনোই না?” সমুদ্র থেকে দূরে আত্ননাদ আবেগ প্রবল যেমন প্রেমাস্পন্দ যুবক যখন নাক উঁচিয়ে দূবে সবে যায়।

এটা খুবই জগন্মী যে একটি নারী কান্নাকাটি করার জন্য সাত সকালে শুয়ে পড়বে, তা নইলে সে দাক্ষণ মুগ্ধে পড়বে।

লবির ছাষাষ নির্গিস্তে গেতে পাবা। আমি আমার কণ্ঠ্য কবি, তুমি তোমার, কোথাও ভীড় নেই।

নৈঃশব্দ্য! নৈঃশব্দ্য! এমন কি পীচ ফলের শাঁস বের কবাও নয় : বিচক্ষণতা, বিচক্ষণতা।

ধনীৰ কাছে যাওয়া হয় না। জ্ঞানীর কাছে যাওয়া হয় না। বিচক্ষণ হয়ে, নিজের আংটায় পাকে পাকে জড়িয়ে থাকা।

ঘরবাড়িগুলো বাধা। বাড়ির আসবাবপত্র-বওয়া মুটেরা বাধা। সটকে পড়া এক বাধা।

ফেলে দেওয়া, পাকা দেওয়া, বক্তৃ দিয়ে নিজের মধু সামলানো, উচ্ছেদ করা, উৎসর্গ করা, শেষ করে দেওয়া-সুগন্ধির মধ্যে বাতর্কর্ম স্কিটলের বেশ কিছু পিন ফেলে দেয়।

হায়! অবসাদ, এই সংসারের প্রয়াস, জগৎজোড়া অবসাদ, বিভূষণ!

লরেলু, লরেলু, আমার ভয় করে...থেকে থেকে অন্ধকার, থেকে থেকে
পাতার শিরশির শব্দ।

শোন। আমি যুত্মার গুঞ্জবনের দিকে এগিয়ে চলেছি।

তুমি আমার দীপগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছ।

বায়ুমণ্ডল একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, লরেলু।

আমার হাতগুলো, কী খোঁয়া! তুমি যদি জানতে...আর মোড়ক নয়,
আর বগুয়া নয়, আর পারা নয়। আর কিছুই নয়, সোনা।

অভিজ্ঞতা : হুতোগ ; পতাকাধারী কী যে উন্মাদ।

...আব বরাবর প্রণালী পার হতে হয়।

আমাব পাগুলো, তুমি যদি জানতে, কি পোঁয়া!

অথচ টানা গাড়িতে সারাক্ষণ আমার কাছে রয়েছে তোমাব মুখ...

ক্যানারি পাখিব বদল দিয়ে তাবা আমায় ঠকানোর চেষ্টা করেছিল।
অথচ আমি অবিরত বলে যাচ্ছিলাম : “কাক! কাক!” তারা ক্লান্ত হয়ে
পড়েছিল।

শোন, আমাকে অর্ধেকেকবণ বেশি গিলে কেলা হয়েছে। আমি নর্দমার মত
ভিজে সপসপে।

ঠাকুরদা বলে, “কোনো বছর, কোনো বছর আমি এত মাছি দেখিনি।”
আর সত্যি কথাটিই সে বলে। সে অবশ্যই তা বলে...হাসো, হাসো,
ছোঁড়ারা, বুঝবে না কখনোই প্রতিটি শব্দের জন্ত আমাকে কতটা ফুঁপিয়ে
ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয়।

বুড়ো রাজহাঁস জলের বুকে তার পদমর্দাণ আর রাখতে পারে না।

সে আর সংগ্রাম করে না। শুধু সংগ্রামের ভাবভঙ্গী।

না, হ্যাঁ, না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরিতাপ করছি। এমনকি পড়ার সময়
জনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমি বিড়বিড় করি। এখন আমি চেটে চেটে পাক খাচ্ছি। কখনো
কখনো অন্ততশক্তি, কখনো কখনো ঘটনা...আমি লিকটের শব্দ শুনছিলাম।
তোমার মনে পড়ে, লরেল, তুমি সময়মত কখনো এসে পৌছতে না।

খনন করা, খনন করা, খাসরোধ করা, নিরন্তর যন্ত্রণার হিমায়ন। ছাই-
ভস্মের ভেতবে ফুরগৎ, কচিং, কচিং ; কচিং মনে পড়ে।

তোমার সঙ্গে ঝাঁপাবে ঢুকে পড়া, কত মিষ্টিই না ছিল, লরেল...

ঐ লোকগুলো হাসে। তারা হাসে।

তারা নড়ে চড়ে। প্রকৃতপক্ষে তারা এক বিপুল নিস্তকৃত্যকে পেরিয়ে
যায় না।

তারা বলে “ঐ ওখানে”। তারা সবসময় “এখানে”।

এসে পৌছনোর মত সাজগোজ নেই।

তারা ভগবানের কথা বলে, কিন্তু তা তাদের পাতা দিয়ে।

তাদের নালিশ আছে, কিন্তু তা হাওয়া।

তাদের রয়েছে মরুভূমির ভয়।

...হিমের খাদে আর বরাবর পায়ে-হাঁটা রাস্তা।

আরাগাল-এর স্মৃতি, এখানেই তোমাদের পতন ঘটে। বুখাই তুমি নিজেকে
নত কর, তুমি নিজেকে নত কর, শিঙার শব্দ, আরো নিচে, আরো নিচে
থাকা...

পাতালে পাখিগুলো আমার পেছনে পেছনে উড়ছিল, কিন্তু আমি পেছনে
কিরলাম আর বললাম, “না। এখানে, পাতাল। আর নিশ্চেতনা তার বিশেষ
অধিকার।”

এভাবে রাজকীয় পদক্ষেপে, আমি একা এগিয়ে গেলাম।

একসময়, যখন পৃথিবী ছিল কঠিন, আমি নাচতাম, আমার বিশ্বাস ছিল।
এখন, কি করে তা সম্ভব হতে পারে? একটি বালুকণাকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
আর সমগ্র বেলাভূমি ধ্বসে পড়ে, তুমি তো জানই।

অবসাদে, মগজের ছাল ছাড়ানো হয় আব তা জেনেগুনেই ছাড়ানো হয়,
এটাই সবচেয়ে দুঃখজনক।

দুর্ভাগ্য যখন তার স্মৃতিশব্দ টান দেয়, কেমন সে ফাঁসিয়ে দেয়, কেমনই সে
ফাঁসিয়ে দেয়!

“মেঘের পেছনে ধাওয়া কব, ধব ঝটাকে, আরে ঝটাকে ধর” সারা সहर
বাজি ধরল। কিন্তু আমি ঝটা ধরতে পাবলাম না। আমি জানি, আমি
পারতাম...শেষবারের মত একটা লাক... তবু আমার আব ইচ্ছে ছিল না।
দিশেহারা, আর সহায়-সম্মল নেই, লাক দেওয়ার আর ইচ্ছে নেই। লোকজন
কোথায় থাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বলা হয়: “হয়তো, হয়তো বা
ভালো,” কেবল চেষ্টা টিপে যেন মারা না হয়।

শোন, আমি চোরাবালিতে নির্মজ্জিত ছায়াও ছায়া।

তোমার আঙুলগুলোতে এমন চপল, এমন ঝরিতগতি, একটি শ্রোত, সে
এখন কোথায়...যেখানে আগুনের ফুলকি বয়ে যেত। আব সবার হাত মাটির
মত, একটা কবরের মত।

জুআনা, আমি থাকতে পারছি না, সত্যি বলছি তোমায়। তোমার জন্ত
আমার কাঠের একটা পা রয়েছে লক্ষীর ভাঁড়ে। আমার খড়ি-ওঠা হৃদয়,
আঙুলগুলো মৃত তোমার জন্ত।

ছোট ছোট স্তম্ভের ক্ষুদ্র হৃদয়, আমাকে আরো আগে আটকানো উচিত
ছিল। তুমি আমার নিঃসঙ্গতা নষ্ট কবেছ। তুমি আমার চাদর কেড়ে নিয়েছ।
তুমি আমার ক্ষতচিহ্নগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছ।

সে আমার হাঁটুর ওপরে রাখা ভাত নিয়ে নিয়েছে। সে আমার হাতে থুথু দিয়েছে।

আমার ডালকুত্তাকে একটা থলেতে পুরে রাখা হয়েছিল। বাড়িটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সুনতে পাচ্ছ, যে চৌচামেচিটা সে করল সুনতে পাচ্ছ, যখন, অন্ধকারের স্রোতগে, ওরা তাকে নিয়ে গেল, মাঠের মাঝখানে সীমানার খুটির মত আমাকে ফেলে গিয়ে, আর আমি ভয়ানক ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিলাম।

দিগন্তে ওরা আমার শুইয়ে দিয়ে গেল। ওরা আমায় আর উঠতে দিল না। হায়! যখন লোকে বাঘের কবলে পড়ে...

মহাসমুদ্রের নিচে বেলগাড়ি, কি যন্ত্রণা! বুঝলে, সেটা মোটেই আর বিছানার পড়ে থাকা নয়। তারপর রাণী হওয়া, যোগ্যতাও রয়েছে তা হওয়ার।

কথাটা তোমাকে বলছি, কথাটা তোমাকে বলছি, সত্যিই খেগানে আমি রয়েছে, আমি জীবনকেও জানি। আমি তাকে জানি। ক্ষতস্থানের চেতনা তার সম্পর্কে অনেক কথা জানে। সে তোমাদেরও দেপে, বুঝলে, আর তোমরা, যে যেমন, তোমাদের সবাইকে বিচার কবে।

হ্যা, ঝাঁধার, ঝাঁধার, হ্যা উদ্বেগ। বিষাদক্লিষ্ট বীজবপনকারী। কী যে নৈবেদ্য! সীমানাচিহ্নগুলো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পালিয়ে গেল। উন্নততার উদ্দেশে, জলোচ্ছ্বসের উদ্দেশে, সীমানাচিহ্নগুলো দৃষ্টিপথ পেরিয়ে পালিয়ে যায়।

মহাদেশগুলি, কেমন দূরে সবে যায়, আমাদের মরতে দেওয়ার জন্ত কেমন তারা দূরে সরে যায়! বেদনার গান গাওয়া আমাদের হাতগুলি শিথিল হয়ে গেল, বিশাল পাল তুলে পবাজয় চলে গেল মহুর গতিতে।

জুআনা! জুআনা! যদি আমার মনে থাকে...তুমি জান যখন তুমি বলেছিলে, তুমি জান, তুমি আমাদের দুজনের হয়ে তা জান, জুআনা!

হায় ! সেই বিদায় ! কিন্তু কেন ? কেন ? শৃঙ্খতা ? শৃঙ্খতা, শৃঙ্খতা, বজ্রণা ;
বজ্রণা, সমুদ্রের বুকে বেনবা একটিমাত্র বিশাল মাস্তুল ।

গতকাল, এই গতকালই, গতকাল, তিন শতাব্দী আগে ; গতকাল, আমার
সাদাসিধে আশাকে মচমচ করে চিবিয়ে, গতকাল, তার দরদী গলা হতাশাকে
খুলোর মিশিয়ে, সন্ধ্যার বাতাসে সহসা আন্দোলিত গাছে, ডানার ওপরে
উন্টে পড়া এক গুবরে পোকায় মত, হঠাৎ পেছনে হেলানো তার মাথা, তার
আনেমোন ফুলের ছোট্ট হাতগুলো জড়িয়ে না ধরে ভালবেসে, আকাজ্ঞা
যেমন জল গড়িয়ে পড়ে...

গতকাল, তোমার শুধু একটা আঙুল বাড়িয়ে দিলেই হত, জুআনা ;
আমাদের দুজনের জন্ত, দুজনেরই জন্ত, তোমার শুধু একটা আঙুল বাড়িয়ে
দিলেই হত ।

স্বপন দাদবহাপাত্র

সমুদ্র

যা আমি জানি, যা আমার, তা হল অনির্দিষ্ট সমুদ্র ।

একুশ বছর বয়সে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সহরের জীবন থেকে ।
হয়েছিলাম নাবিক । জাহাজে কাজ থাকত । আমি অবাক হতাম । আমি
ভেবেছিলাম, জাহাজে লোকে কেবল সমুদ্র দেখে । অনন্তকাল সমুদ্র দেখে ।

জাহাজগুলোকে নিরস্ত্র করা হল । স্তর হল সমুদ্রের মানুষদের বেকার দশা ।

আমি পেছন কিবে চলে গেলাম, কিছু বললাম না, আমার ভেতরে সমুদ্র,
আমার চারদিকে চিরন্তন সমুদ্র ।

কোন সমুদ্র ? সে কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে পারব না ।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী-খানদাশিখ

লাজারাস, তুমি ভূমিকে আছো ?

বুদ্ধ ভায়ুর বুদ্ধ

মাটির

কর্তৃত্বের

জাতির

ধ্বংসের

লোহার

চাকরদের

টুপির

বাতাসের

বাতাসের

বাতাসের

বাতাসেব চিহ্নেব, সমুদ্রেব, মিথ্যার,

সীমাস্ত্রের, জট পাকানো—আমাদের জটে জড়ানো ছুপেব

অস্ত্রের তলায়, ঘণাব তলায়

গতকালেব তলায় পড়ে যাওয়া মূর্তিব ধ্বংসের তলায়

“ভেটো”ব বিরাট ফাঁদেব তলায়

জঞ্জালের মধ্যে বন্দী

আগামীকালের তলায় মজা ভাঙা, আগামীকালের তলায়

আগামীকালের তলায়

ইতিমধ্যে কোটি কোটি মানুষ

বিদায় নিচ্ছে মৃত্যুর পথে

একটা আত্ননাদ অঙ্গি না করে

কোটি কোটি মানুষ

বারোমিটার জমে বাচ্ছে একটা পায়ের মত

কিন্তু এক প্রচণ্ড জোরালো কণ্ঠস্বর---

আর কোটি কোটি মানুষ আদেশ মেনে উত্তরে বা দক্ষিণে

বিদায় নিচ্ছে মৃত্যুর পথে

লাজারাস, বল, তুমি কি ভূমিয়ে আছো ?

ওরা মরছে, লাজাবাস

ওরা মরছে

শবের আচ্ছাদন ছাড়া

মার্পা বা মেরিকে ছাড়া

এমনকি অনেক সময় মৃতদেহ ছাড়া

পাগল যেমন শামুকের খোল। ছাড়াতে ছাড়াতে হাসে

আমি চিংকার করছি

আমি চিংকার করছি

আমি চিংকার করছি বুদ্ধিভ্রংশের মত তোমার উদ্দেশ্যে

তুমি কিছু শিখে থাকলে

এবার তোমার পালা

তোমার পালা, লাজাবাস !

মুদ্রিকা চক্রবর্তী-খাসমনিষ

হান, ব্লুর্ড, কালের উত্তরণ

বিস্তার বা বিস্তৃত করে, বেড়ে ওঠে, প্রসারিত হয়, আমায় প্রসারিত করে ।
কী যে ঘটে, যা হাল চেড়ে দেয়, সংগীত যা আমার মধুবীষ পরিয়ে দেয়,
আমায় অবগাহন করায় । উবার আলোয় ভরপুর মাথা, অর্গলহীন দরজাগুলো
ঠেলে ঠেলে আমি এগিয়ে যাই ।

আরো অবসাদ । আশ্রয়ের ইচ্ছা নাই । এমন সুন্দর এই পুনর্জন্ম : চার-
দিকে চেতনাময় প্রভাত । একি সম্ভব ? একি সত্য ? অমঙ্গল, উদ্বেগজনক
অস্তহীন অমঙ্গল, আচ্ছাদন, অদৃশ্য এক আচ্ছাদন তাকে অস্তহিত করে
দিয়েছে ।

আনন্দ ! আমার আর নিচে নেমে যেতে হবে না ।

আবির্ভাব, নতুন এক আবির্ভাব । আবির্ভাবের নদী বয়ে চলে যায় ।
আবির্ভাব ছাড়া আর কিছুই নেই ।

উচ্ছ্বাস, অস্বহীন উচ্ছ্বাস, যত নিবেধকে পরিমিতিকে দূরে সরিয়ে দেয়, ভরিয়ে দেয়, ভরিয়ে দেয়, সমাধি-সৌধ যা আবার বয়ে যাবে। প্রস্তাবিত চেউয়ের ওপর আমার চেউগুলি, নিজস্ব চেউগুলি, চেউয়ের ওপর ভ্রাম্যমাণ চেউগুলি।

মুহূর্তগুলি, গতিপশহীন, সম্বলহীন, প্রত্যাবর্তনহীন, মিলনহীন, প্রবহমান, স্বাধীন মুহূর্তগুলি।

একটি বৃন্ত মুহূর্ত, একটি নিরস্ত্র মুহূর্ত, একেবারে ধরা পড়া একটি মুহূর্ত চলে যায়। একটি মুহূর্ত আগে আগে চলে, একটি মুহূর্ত তাড়াহাড়ে করে, একটি মুহূর্ত ডাক দেয়, প্রতিধ্বনি একটি মুহূর্ত।

একটি মুহূর্ত আবার চলে যায়, ছেড়ে যায়, সাবিত্তে দাঁড়ায়, তারপর একটি মুহূর্ত, একটি মুহূর্ত ডুবে যায়, একটি আত্মীয় মুহূর্ত, আবার দেখাব একটি মুহূর্ত। আবার একটি মুহূর্ত।

স্থির একটি মুহূর্ত, নিজেব জাযগা পান্টানোর সূরুর একটি মুহূর্ত, অন্ধকার একটি মুহূর্তের আবিষ্কার কোরে, একটি মুহূর্ত আগাগোড়া আন্দোলিত করে।

চূড়ান্ত 'না'-র একটি মুহূর্ত; আবো দ্বিধাগ্নিত একটি মুহূর্ত, অল্পকূল, আনুকূল্য দেখানো, অমায়িক একটি মুহূর্ত, আমার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সঙ্গত একটি মুহূর্ত, স্বর্ণশাখার চাহিদার একটি মুহূর্ত।

গলুইয়ের ফিরে আসা একটি মুহূর্ত, শিক্ষার্থী একটি মুহূর্ত, এপনো অকপট একটি মুহূর্ত, একটি মুহূর্ত যে কেবল প্রশস্তি করে, একটি মুহূর্ত যে পেছনে ফিরিয়ে আনে, একটি মুহূর্ত যে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য রেখেছিল।

একটি মুহূর্ত যে সবকিছু পান্টে দিতে চলেছে।

অতুলনীয় একটি মুহূর্ত।

ভ্রমণরত একটি মুহূর্ত, ভ্রমণ থেকে ফিরে আসা একটি মুহূর্ত।

আরো যত মুহূর্তকে ডাক দেওয়া একটি মুহূর্ত।

জলধারার বুকে একটি মুহূর্ত, বাতাসের ডানায় একটি মুহূর্ত, এককাক
মুহূর্তের ওপর কের পড়ে যাওয়া একটি মুহূর্ত ।

পিছলে পড়া একটি মুহূর্ত । চোখের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া একটি মুহূর্ত ।
ফিরে আসে একটি মুহূর্ত ।

ইতিমধ্যে ফিরে যাওয়া একটি মুহূর্ত ।

একটি মুহূর্ত যে আর এগিয়ে যায় না । আশঙ্কায় ভারী একটি মুহূর্ত ।

একটি মুহূর্ত ইতিমধ্যেই যে কালের পদধ্বনি শুনিয়ে দেয় ।

একটি মুহূর্ত যা ছিল নিতান্তই একটা ফাঁক । বিপর্যস্ত একটি মুহূর্ত ।
কোন কিছুই সঙ্গে জড়িয়ে নেই এমন একটি মুহূর্ত এখন দীপ্তিময় ।

এখনো অনাগত একটি মুহূর্ত ।

অন্ত এক জীবনের একটি মুহূর্ত ।

শিহরিত একটি মুহূর্ত । একটি মুহূর্ত যে ববং হৃদয়কে শাস্ত কবে ।

কাটাকুটিহীন একটি মুহূর্ত । যথার্থই শালুক একটি মুহূর্ত ।

একটি মুহূর্ত যে বাস্তা পাব হয়ে যায় । একটি মুহূর্ত যে জোর করে না ।
ববং ভবমুবে একটি মুহূর্ত ।

মহান মুহূর্তগুলির পরবর্তী একটি মুহূর্ত ।

উন্মেষক একটি মুহূর্ত, একটি মুহূর্ত যে আমার ওপর আস্থা রাখতে চায় না,
গোলাপের পাপড়ির ওজন একটি মুহূর্ত পরে যেসীসার মতো ভারী হয়ে উঠবে ।
একটি মুহূর্ত অবশ্যই যেন ও আর আসবে না ।

আমাকে ছাড়া যাযাবরেরা । মুহূর্তেরা, লব্ধ মুহূর্তেরা, উজ্জল পাকের ভেতর,
প্রাণচঞ্চল, খুঁজে উপনদীগুলি ।

কারো জন্ত নহে এমন অর্থ্য, অক্ষরহীন কণ্ঠ, যন্ত্রহীন ধ্বনি, অবিরত পাশ্চটে
যায় যে সঙ্গীরা, মূল্লিত সঙ্গীত ।

আগত, বিগত, সীমানাহীন, সমস্ত পরিপূর্ণতার প্রবাহিত প্রতিবন্ধক,
বিচ্ছেদের শিক্ষা না দিয়েই বিচ্ছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া,
মূহুর্তেরা, মর্ম্মর-ধ্বনি, কালের উত্তরণ ।

শুকব দাশগুপ্ত



ফ্রঁসিস পৌজের কবিতা

ক্রীসিস পৌঁছ

সিগারেট

প্রথমেই উপস্থাপিত করি আলুখান্, একই সঙ্গে ধোঁয়াটে আর শুকনো পবিমগুল যেখানে ঐ পরিবেশ সৃষ্টি করার পর থেকে সিগারেট সারাক্ষণ উন্টোভাবে বসানো রয়েছে।

এরপর তার আকৃতি : যতটা দীর্ঘ তার চেয়ে অনেক বেশি গন্ধময় ছোট্ট একটা মশাল, তাব থেকে পবিমাপ কবা যায় এমন তালে গণনীয় সংখ্যাব চাইযেব ছোট ছোট পুঞ্জ গমে পড়ে।

সবশেষে তার পবিত্র মৃত্যু-যজ্ঞা : রূপালি চামড়া খসে পড়া এই জ্বলন্ত বোতাম, অতি সম্প্রতি গড়ে ওঠা একটা অব্যবহিত আংটা তাকে ঘিরে থাকে।

শুদ্ধ দাশভঙ্গ

রুটি

রুটিব ওপবটা দাক্ষণ, কেননা প্রথমে তার থেকে একটা আধা প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুভব লাভ করা যায় ; যেনবা হাতেব কাছেই ইচ্ছেমতন রয়েছে আল্লস্, তোরাস কি এণ্ডিজ পর্বতমালা।

এভাবে উদগার তুলতে থাকা একটা আকাবহীন তালকে আমাদের জন্ত নাক্ত্র চুল্লীর মধ্যে পুরে দেওয়া হোল, সেখানে শক্ত হয়ে উঠতে উঠতে ওটা উপত্যকা, পর্বতশিখর, তরঙ্গ, খাদের আকাব নিল... আর তখন থেকে এই ছকগুলি সব এমন একেবারে জোড়া, এই পাতলা শানের টালিগুলি যার ওপর আলোক সঘন্থে তার আঙুনকে গুইয়ে দেয়,—নিচের নগণ্য কোমলতার দিকে একবারও চোখ ফেল না।

ঐ আলগা আর ঠাণ্ডা মাটির তলা যাকে বলা হয় রুটির বুক তার তন্ত

আঞ্জের ডঙ্কর মতন : পাতা বা ফুল সেখানে শ্রামদেশীয় যমজ বোনের মত কনুয়ে কনুয়ে পেঁটে রয়েছে। কুটি যখন বাসি হয়ে ওঠে তখন ঐ ফুলগুলো শুকিয়ে কুকড়ে যায়, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর ভালটা ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে...

এবার তবে ওটাকে ভাঙা যাক— কেননা সম্মানের জিনিস হওয়ার চেয়ে কুটির হওয়া উচিত আমাদের যুগের মধ্যে ভোগের জিনিস।

পৃষ্ঠ ১ দশমস্ত

আগুন

আগুন একটা বিজ্ঞাস কবে নেয় : প্রথমে সবগুলো শিখা কান একটা দিকে ছুটে যায়...

(আগুনের চলাকে প্রাণীদের চলাব সঙ্গে তুলনা করা যায় না : একটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে তবে অন্য একটা জায়গা তাকে দগল করতে হয়, 'আগুন একই সঙ্গে অ্যামিবা আর জিরাফের মতন চলে, ঘাড় থেকে লাকিয়ে ওঠে, প। থেকে বুকে হেঁটে চলে)...

তারপর, যখন নির্দিষ্ট নিয়মে খুঁকালি মাথা বস্তু-পিণ্ডগুলো ধরতে পড়ে, তখন যেসব বাষ্প বেরিয়ে আসে সেগুলো ক্রমশ একসব প্রজাপতিতে পরিণত হয়ে যায়।

পৃষ্ঠ ১ দশমস্ত

প্রজাপতি

যখন বোটার ভেতর ক্রমশ তৈরী হওয়া শর্করা, অম্লের দোয়া পেয়ালার মতন ফুলগুলির তলায় উঠে আসে, দারুণ কর্মচাঞ্চল্য জেগে ওঠে মাটির বুকে— যেখান থেকে প্রজাপতিরা হঠাৎ উড়তে শুরু করে।

তবে যেহেতু প্রতিটি স্ত্রীপোকার ছিল দুটিহীন কালো হয়ে থাকা মাথা,

আর বখার্ব বিস্ফোরণে বিশীর্ণ শরীর যার থেকে তার সুবাস ডানাগুলি জলে ওঠে।

সেই থেকে অস্থির প্রজ্ঞাপতি গতিপথের এখানে ওখানে ছাড়া আর বসে না, বা ওরকমই কিছু একটা করে।

উড্ডম দীপশলাকা, মিথা তার সংক্রামক নয়। আর তাছাড়া খুবই বিলম্বে সে হাজির হয় আর শুধু ফোটা ফুলগুলোরই সে পরিচয় পায়। হলে কি হবে : প্রদীপ-জালিয়ার মত যেতে যেতে সে প্রতিটি ফুলের তেলের সঞ্চয় কতটা দেখে নেয়। ফুলের মাথাব ওপর সে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলা নিজেব অপুষ্ট শরীরটাকে রাখা আর এমনি করেই তার দীর্ঘ অবয়বহীন স্তম্ভ্যাপোকার অবমাননাব শোধ নেয়।

বাডতি পাপড়ি ভেবে বাতাস তাকে খারাপ ব্যবহার কবে—বায়ুমণ্ডলের খুদে পালতোলা নৌকা, সে ঘুরে বেড়ায় বাগানে।

পুঙ্খ নাশপুঙ্খ

তিমটি দোকান

মোবের ঝোয়ারের কাছে, যে জায়গায় প্রতিদিন ভোরবেলা আমি বাসেব জন্ম অপেক্ষা করি, সেখানে পাশাপাশি রয়েছে তিমটি দোকান : গয়নার দোকান, কাঠ আর কয়লার দোকান, মাংসের দোকান। একেব পব এক তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার চোখে পড়ে ধাতু, দামী পাথর, কয়লা, কাঠের গুঁড়ি আর মাংসের টুকরোর বিভিন্ন আচরণ।

ধাতুর কাছে বেশিক্ষণ আমাদের দাঁড়াতে হবে না। ধাতুগুলি হোল খনিজ কর্দম আর কিছু কিছু আকবিক পিণ্ডের ওপর মানুষের প্রচণ্ড এবং বিভাজন-কারী কর্মের ফল। ঐ জিনিসগুলির ওরকম কোন অভিপ্রায় কখনোই ছিল না। দামী পাথরগুলোর কাছেও দাঁড়াতে হবে না—ওদের দুঃস্বাপাত্য সত্যি এমনই করে তুলবে যে প্রকৃতি-বিষয়ে পক্ষপাতদীনভাবে রচিত কোন ভাষণে খুব বাছাই করা কিছু শব্দই ওদের শুধু মজুর করা যায়।

আর মাংসের ব্যাপারে বলতে গেলে, তাকে দেখলে একটা কাঁপুনি, এক

ধরনের আতঙ্ক বা সমবেদনা আমাকে একান্তভাবে সতর্ক থাকতে বাধ্য করে। আবার সবেমাত্র কাটা হলে একটা স্বল্প জলীয় বাষ্প বা ঘোঁসার আবরণ তাকে যথার্থ বিতৃষ্ণার পরিচয় দিতে উৎসুক দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখে : যখন আমি এক মিনিট তার স্পন্দিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলব তখন আমি যা পারি বলে দেব।

তবে কাঠ আর কয়লার দিকে মনোযোগ দেওয়াটা আনন্দের একটা উৎস। ঐ আনন্দ যতটা সংযত এবং নিশ্চিত ততটাই সহজ, যা আমি তাগ করে দিতে খুশি হবো। নিঃসন্দেহে ওতে কয়েক পাতা লেগে যাবে, সে জায়গায় এখানে আমি খরচ করছি শুধু এক পাতার অর্ধেকটা। এ কারণে আমি আপনাদের কাছে গভীর চিন্তার জগৎ এই বিষয়টা উত্থাপিত করেই সন্তুষ্ট থাকছি : “১) গুণ্ড খণ্ড কাজের সময় মৃত্যুর দ্বারা শোধ নেয়। ২) বাদামী, কেননা বাদামী হোল অঙ্গারীভবনের পথে সবুজ এবং কালোব মাঝামাঝি, কাঠের ভাগ্যেব মধ্যে—সামান্যতম হলেও একটা ভঙ্গি রয়েছে, অর্থাৎ কিনা ভ্রম, ভুল পা ফেলা, আব সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি।”

পুঙ্খব দাশগুপ্ত

বাক্‌পট্ট

আমার মনে হয় প্রকৃতি হোল কয়েকজন যুবককে আত্মহত্যা ও পুলিশ কিংবা দমকল বাহিনীতে নাম লেখানো থেকে বাঁচানোর। আমি তাদের কথা ভাবছি যারা আত্মহত্যা কবে বিতৃষ্ণায় কেননা তারা বুঝে কলে যে “অন্তেরা” তাদের মধ্যে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে।

তাদের বলা যেতে পারে : অন্ততপক্ষে তোমাদের সংস্কৃতি নিজস্বতাকে ভাষা দাও। কবি হও। তারা উত্তর দেবে : কিন্তু ওখানেই বিশেষ করে, ওখানেও আমি দেখি অস্ত্রদের আমার জায়গায়, যখন আমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাই, পারি না। সব কথাই তৈরী হয়ে আছে, আর তৈরী হয়ে

প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারা আমার কথা মোটেই বলে না। এখানেও আমি হাসরুদ্ধ।

তখন শেখানোর প্রয়োজন হয় কী করে কথার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়, শুধু বলা যেটা বলতে চাই, কেমন করে শব্দগুলোকে তীব্র আর তীব্র করে তোলা যায়, কেমন করে তাদের বানানো যায় আমার ক্রীতদাস। সব মিলিয়ে শব্দ আর কথা সাজানো, কিংবা, বরং বলা যায়, প্রতিটি লোককে তার নিজের কথা শুঁছিয়ে বলতে শেখানো, সমাজের যেকোন মহৎকর্মেব মতই একটি।

তা রক্ষা করে সেই নিঃসঙ্গ, অতি অল্প কয়েকজন মানুষকে—যাদের রক্ষা করা সত্যিই প্রয়োজন। বাবা সচেতন, উদ্বিগ্ন, আর যাদের মধ্যে রয়েছে অস্ত্রের সম্পর্কে কেবল বিরক্তি আব ঘৃণা।

সেই কয়েকজন যারা চেতনার বিকাশ খটাতে পারে, এবং, সত্যি কথা বলতে কি, যারা পারে চারপাশের এই জিনিসগুলোর আকৃতি বদলে দিতে।

কৌশলিক চট্টোপাধ্যায়

উপবৃত্তাকার রেজিষ্টার

শহরের প্রায় জনমানবহীন পরিত্যক্ত যে এলাকার মধ্য দিয়ে আমি চলে-ছিলাম, সেটি আর কিছুই নয় শহরের সষভে নির্মিত বিশালকায় প্রাচীরগুলোর বেষ্টনী দিয়ে তৈরি অনেকগুলো প্রকাণ্ড অংশেব একটি; ডুবু ডুবু স্থধেব আলোয় তখন তা লাল হয়ে আছে।

আমার বাঁদিকে চলে গিয়েছে বাস্তা, সেখানে ছোট ছোট বাড়ি। শুকনো খটখটে আর ময়লা সেই বাস্তাটি এক আধা-নিভন্ত আনন্দময় আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কোনাকুনি দেখা যাচ্ছে একটু হেলে পড়া একটা গাছকে ধিরে ছোট্ট একটা নাগরদোলা—ছোট্ট একটা পেয়ারাগাছের চেয়ে খুব বেশি বড় নয়; তাতে ঘুরছে কতকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে, যাদের একজনের গায়ে হলুদ সোয়েটার।

আমি একটা বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম—যেন অনেকগুলো বেহালা বেজে চলেছে, তালে তালে, কিন্তু কোন সুরের বালাই নেই।

বাতাসে অশ্রুভব করছিলাম খুব বিরাট কিছু একটার আবির্ভাব, যা কোন রাজনৈতিক কিংবা সামরিক ঘটনার চাইতে বরং বলা যেতে পারে কোনও একটা খুব বড় বুদ্ধিবৃত্তি বা হুক্তিতর্ক সমন্বিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

আমি সেদিন নৈশভোজে আপ্যায়িত সেই সাহিত্যিকের বাড়িতে, যিনি আমার অগ্রজ, সমকালীন সাহিত্যের বাজাদেব একজন। আমি নিশ্চয় জানতাম তার মুখে শুনতেপাব যে আমাদের মানসিক নৈকট্য চিরস্থায়ী হবে।

নিজেকে আমার মনে হচ্ছিল এক বিজয়ী, এই বেহালাব ঝংকারে সম্মানিত।

একই সঙ্গে আমি অশ্রুভব করছিলাম আমার মুখে হাতের চেটোয় এক পডন্ত, অথচ খুব কাছাকাছি গনগনে সূর্যের তাপ; এবং তখনই সহসা বুঝতে পারলাম যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, যখন, জেগে উঠতে গিয়ে দেখি, আর চোখ খুলতে পারছি না।

চোখের পাতার অনেককম কসবতের পবেও আমি তা খুলতে পারলাম না। আসলে হয়েছিল কি, পরে আমি যা বুঝেছিলাম, ওই চোখের পাতার ব্যাপারটাতে আমি গোলমাল করেছিলাম। আমি চাপ দিচ্ছিলাম ক্রমাগত অক্সিগোলকের ওপব—কলে চোপ গিয়েছিল উলটে।

ব্যাপারটা প্রায় করুণ হয়ে উঠেছিল, এমন সময় একটুক্ষণেব জন্তে আমি আমার সবকম চেষ্টা ছেড়ে দিলাম, আমার চোখের পাতা আপনা আপনিই খুলে এল, আর আমি দেখতে পেলাম উপবৃত্তাকার বেড়িয়েটাের গনগনে কুণ্ডলীটা, আমার চেয়ারেই একটা বইয়ের স্তূপের ওপর বসানো, যা আমাকে আঁচ দিচ্ছে।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কলমের গাপটা আঙুলের ফাঁকে, অথু হাতে আমার লেখার সবজাম, নিচে আঁচডহীন শাদা পাতাটা যাতে শুধু আমি লিপিবদ্ধ করতে পারি যা ঘটে গেল আগে, সমাপ্তিব জন্তে বহুযত্নে রাখা এই শিরোনামটির তলায়—“দিনশেষের আলোয় বিজয়ের অশ্রুভূতি, আর তার ভয়াবহ পরিণতি।”

কৌলিক চট্টোপাধ্যায়

বাইরে থেকে এই পালিশ করা বাস্‌জটার কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা বোতাম একটু পরে টিক্ করে ওঠা পৰ্বন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে ভেতরে আয়ুর্ষিনিয়মেব কয়েকটা ছোট ছোট আকাশ-ছোয়া বাড়ি অবিলম্বে যুহু জলে ওঠে, যখন হিংস্র যত চিংকার বেবিয়ে এসে আমাদের মনোযোগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতণ্ডা বাধায়।

আশ্চর্য নির্বাচন ক্ষমতাওয়ালা ছোট্ট একটা যন্ত্র, আহা, নিজের কানকে এমন উন্নত কবতে যন্ত্রটা কী যে দক্ষ! কি জন্তু? তাতে জঘন্ততম অসভ্যতাব অত্যাচাবকে অবিবাম টেলে দেওয়ার জন্তু।

বিশ্ব সুরেব গোময়-গোমুত্রেব সবটা প্রবাহ।

তা বেশ, যাই হোক এটাই ঠিক! গোবরটাকে বাইবে বের কবে রোদে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত: এমন একটা প্লাবন প্রায়শ উর্বর কবে তেলে... তবু, ব্যাপাবটা সাজ করাব জন্তু দ্রুত পায়ে বাস্‌জটার কাছে ফিবে আসা যাক।

কয়েক বছর ধবে ঘরে ঘরে সমাদৃত—সবগুলি জানলা হাট কবা বৈঠক-খানার মাঝখানে গুঞ্জনময়, উজ্জল, ক্ষুদ্রাকার দ্বিতীয় ডাস্টবিন।

গুরুব দাশগুপ্ত

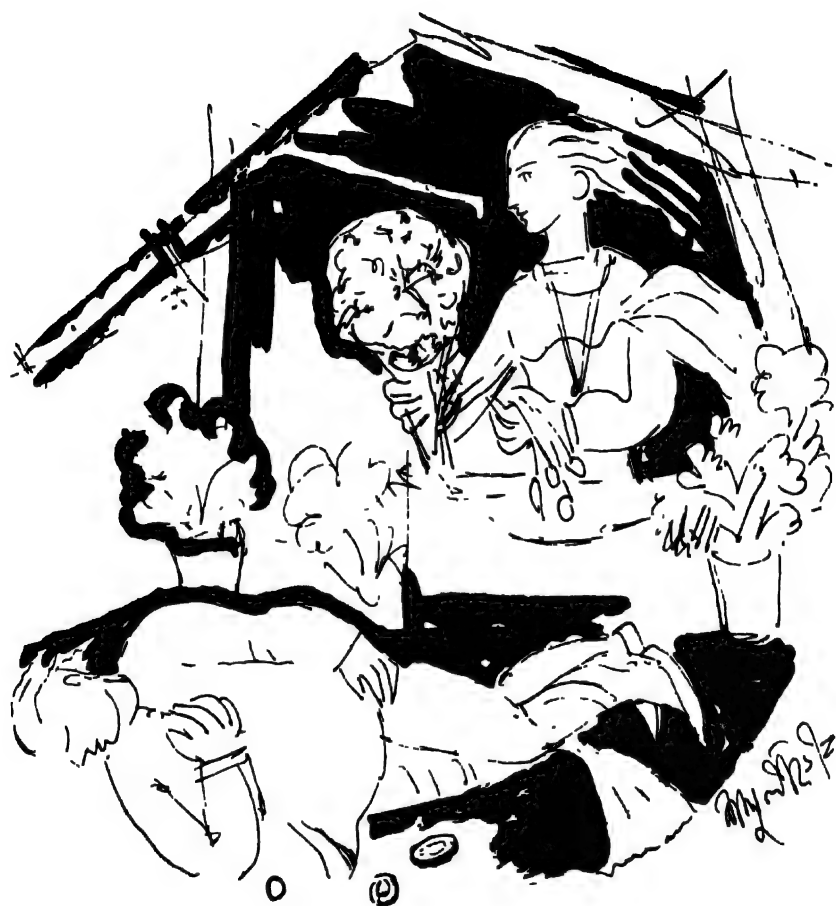
স্টাটেকেস

আমার স্টাটেকেস ভানোয়াজ পাহাড় অবধি আমার সঙ্গে থাকে, আর এর মধ্যে তার নিকেল বকরক করতে থাকে আর তার মোটা চামড়া গন্ধ ছড়ায়। তাকে আমি হাতের চেটোয় রাখি, তার পিঠ, বাড় আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। কেননা ঐ বাস্‌জটা বইয়ের মতন সাদা ভাঁজ করা সম্পদে ভরা: আমার একমাত্র বস্ত্র, আমার প্রিয় পাঠ্যবস্ত্র আর সবচেয়ে সাদামাটা জিনিষপত্র,

সত্যি, বইয়ের মতন ঐ বাক্সটা আবার একটা ঘোড়ারও মত, আমার পারে
পায়ে অবিচল লেগে থাকে, তাকে জিন পরাই, সাজসজ্জা পরাই, ছোট্ট একটা
বেঞ্চির ওপর, জিন পরাই আবার লাগাম লাগাই, বহুশ্রমত হোটেলের ঘরের
ভেতর জিন লাগাই আবার ফিতে বাঁধি।

সত্যি, একালের একজন ভ্রমণকাব্যীরা কাছে স্মার্টকেসটা ঘোড়ার অবশেষ
হয়ে রয়েছে।

পুঙ্খ মাশগুল



জাক প্রেভেরের কবিতা

জাক প্রেভের

বার্বারা

স্মরণ করো বার্বারা

সেদিন ব্রেস্ত-এর উপর অবিরাম বৃষ্টি পড়ছিল

তুমি হেঁটে চলেছিলে হাসিমুখে

ধারান্নানে বৃষ্টির স্রুথে

বিকশিত হ'য়ে

স্মরণ করো বার্বারা

অবিরাম বৃষ্টি পড়ছিল ব্রেস্ত-এব উপর

আমি তোমার পাশ দিয়ে চ'লে গেলাম

সিয়াম সরণিতে

তুমি হাসছিলে

আমিও তেমনি হাসছিলাম

স্মরণ করো বার্বারা

তোমাকে আমি চিনতাম না

তুমি আমাকে চিনতে না

স্মরণ করো

স্মরণ করো তবুও সেই দিনটা

ভুলো না

একটি লোক বারান্দার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল

সে তোমার নাম ধ'রে ডাকল

বার্বারা

এবং তার দিকে তুমি ছুটে গেলে

ধারান্নানে বিকশিত হ'য়ে

তারপর তার বাহুবন্ধনে তুমি ধবা দিলে

স্মরণ করো সে-কথা বার্বারা

আমার উপর রাগ কোরো না যদি তোমাকে

আমি তুমি-তুমি করি

ষাদের আমি ভালোবাসি তাদের সকলকে তুমি বলি
 এমনকি যদি তাদের শুধু একবারই দেখে থাকি
 যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আমি তাদের তুমি বলি
 এমনকি যদি তাদের আমি নাও চিনি
 স্মরণ করো বার্বারা
 ভুলো না সেই নম্র আনন্দিত বৃষ্টি
 তোমার আনন্দিত মুখের উপর
 সেই আনন্দিত শহরের উপর
 সেই বৃষ্টি সমুদ্রের উপর
 অস্ত্রশালার উপর
 জাহাজের উপর
 ও বার্বারা
 যুদ্ধটা কী ধাষ্ট্যমো
 এই লোহা আর আগুন
 আর ইম্পাত আর বক্তব্য বৃষ্টিব মণ্ডো
 তোমার কী হল
 আর সেই লোকটার যে তোমাকে বুকে চেপে ধরেছিল
 ভালোবেসে
 সে কি ম'বে গেল নিখোঁজ হল নাকি এখনও বেঁচে
 ও বার্বারা
 আবিরাম বৃষ্টি পড়ছে ব্রেস্ত-এর উপর
 আগে যেমন পড়ত
 কিন্তু তা আব একরকম নয় সবই নষ্ট হয়েছে
 এ বৃষ্টি শোকের আশাহীন সাংঘাতিক
 এমনকি লোহা ইম্পাত রক্তের
 ঝড়ও এ আর নয়
 এ নিছক মেঘ
 যা রাস্তার কুকুরের মতো ফেটে যায়
 সেই সব কুকুরের মতো যারা
 ব্রেস্ত-এর জলের স্রোতে অদৃশ্য হয়

আর দূরে গিয়ে পড়ে
দূরে ত্রৈলোক্য থেকে অনেক দূরে
বাহের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না ।

অক্ষয় মিত্র

ফুলওয়ালীর দোকানে

একজন লোক ঢুকল ফুলওয়ালীর দোকানে
ফুল বাছাই করল
ফুলগুলোকে জড়িয়ে দিল ফুলওয়ালী
লোকটা পকেটে হাত দিল
টাকা বের করবার জন্তে
ফুল কেনাব টাকা
কিন্তু সেই সময় সে
হঠাৎ
হাত দিল তার হৃদয়ের উপরে
এবং প'ড়ে গেল
যখন সে পড়ল সেই সময়
টাকা গাড়িয়ে পড়ল
তারপব ফুলগুলো পড়ল
লোকটার সঙ্গে সঙ্গে
টাকার সঙ্গে সঙ্গে
ফুলওয়ালী দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে
আর টাকা গড়াতে লাগল
ফুলগুলো নষ্ট হ'য়ে এল
লোকটা মরতে থাকল
স্পষ্টতই ব্যাপারটা বড় কল্পন

তার নিশ্চয় কিছু করা দরকার
ফুলওয়ালীর
কিন্তু কিভাবে কি করবে সে জানে না
সে জানে না
কোথা থেকে শুরু করবে

এত জিনিষ করবার আছে
যখন ঐ লোকটা ম'রে যাচ্ছে
ঐ ফুলগুলো নষ্ট হচ্ছে
আব ঐ টাকা
ঐ টাকা গড়াচ্ছে
তার গড়ানো আব থামছে না ।

অকণ মিগ্র

তোমার জন্তে আমার প্রিয়া

আমি গেলাম পাণিব বাজাবে

কিনলাম পাখি

তোমার জন্তে

ও আমার প্রিয়া

আমি গেলাম ফুলের বাজারে

কিনলাম ফুল

তোমার জন্তে

ও আমার প্রিয়া

আমি গেলাম লোহার বাজারে

কিনলাম শিকল

ভারী ভারী শিকল

তোমার জন্তে

ও আমার প্রিয়া

তারপর আমি গেলাম বীরী বাজারে
সেখানে তোমাকে খুঁজলাম
কিন্তু তোমাকে গেলাম না
ও আমার প্রিয়া ।

অকণ মিত্র

উদ্ভাস

হাজার হাজার বছরেও কুলোবে না
যদি বর্ণনা কবতে যাউ
চিরন্তন কালের সেই ছোট্ট মুহূর্তটা
যখন তুমি আমাকে চুমু গেলে
যখন আমি তোমাকে চুমু গেলাম
শীতের এক সকালের আলোয়
ম'সুবি পার্কের ভিতরে পারীতে
পারীতে
পৃথিবীর উপর
পৃথিবী যা এক নক্ষত্র ।

অকণ মিত্র

বেলায় দু'ম ভাঙলে

সাংঘাতিক

টিনের পাতমোড়া টেবিলেব ওপর শক্ত ডিম ভাঙাব

ছোট্ট আওয়াজটা

সাংঘাতিক সেই আওয়াজ

যখন তা কুখার্ত মাহুঘটার স্থতির মধ্যে নড়ে

ওটাও সাংঘাতিক মাহুঘের মাথাটা

কুখার্ত মাহুঘের মাথাটা

যখন সে সকাল ছ'টার সময়
 বড় দোকানের আয়নার নিজেকে দেখে
 ধুলোরঙের একটা মাথা
 কিন্তু নিজের মাথা সে দেখে না
 পোর্ত্যার দোকানে জানলার কাছে
 মাল্লুঘটার নিজের মাথা নিয়ে খোড়াই পবোয়া
 তার কথা সে ভাবে না
 সে স্বপ্ন দেখে
 কল্পনা করে আর একটা মাথা
 যেমন একটা বাছুরের মাথা
 একটু ঝোলের সঙ্গে
 কিম্বা খাওয়া যায় এমন যে-কোনো একটা মাথা
 এবং সে আন্তে আন্তে চোয়াল নাড়ায়
 আন্তে আন্তে
 আর দাঁত কডমড করে আন্তে হান্তে
 কাবণ ছুনিয়া তাকে নিয়ে ভামাশা করে
 অথচ সে কিছুই করতে পারে না এই ছুনিযাব বিকঙ্কে
 সে তার আঙুলে গোনে এক দুই তিন
 এক দুই তিন
 তিন দিন তৈ হল সে কিছু খায় নি
 তিন দিন ধরে সে বুধাই বলছে
 এরকম চলতে পারে না
 কিন্তু চলে
 তিন দিন
 তিন রাত না খেয়ে
 আর ঐ জানলার কাচের পেছনে
 ঐ তৈরি মাংস ঐ বোতল ঐ আচার
 মরা মাছ কোঁটোর আশ্রয়ে
 কোঁটো কাচের আশ্রয়ে
 কাচ পুলিশের আশ্রয়ে

পুলিশ ডয়ের আশ্রয়ে
 কত বে পাঁচিল ছয়টি হতভাগা পুঁটিমাছের জন্তে-
 আর একটু দূরে কাকিখানা
 ককিছু আর গরম টোস্ট
 মাল্‌বটা টলে
 আর তার মাথার মধ্যে
 কথার কুরাশা
 কথার কুরাশা
 খাবার জন্তে তৈরি পুঁটিমাছ
 শক্ত ডিম ককিছু
 ককি রাম-মেশানো
 ককিছু
 ককিছু
 ককিখুন রক্ত-মেশানো ।...
 পাড়ার খুব সম্মানিত একজন লোক
 দিন দুপুরে খুন হয়েছেন
 ভবঘুরে খুনীটা তাঁর কাছ থেকে লুট কবেছে
 দু'টো আখুলি
 মানে একপাড়া রাম-দেওয়া ককি
 লুপ্ত আখুলি সাত আনা
 দুটো মাখন-মাখানো রুটি
 আর বয়ের বকশিস দু'আনা ।
 সাংঘাতিক
 টিনের পাতমোড়া টেবিলের ওপর ভাঙা
 শক্ত ডিমের ছোট্ট আওয়াজটা
 সাংঘাতিক সেই আওয়াজ
 যখন তা স্বভির মধ্যে নড়ে
 কুখার্ত মাল্‌বটার ।

অক্ষয় মিত্র

শতকেত্রে সম্মানকেত্রে---

মনে হয় আছে
এক গোলাপ-বাগানে
একটিই গোলাপ
যার নাম ৬প্রেসিডেন্ট ডুমের্গ-এব সাক্ষনাহীনা বিধবা
বড়ই করুণ
বড়ই শোচনীয়
আছে
বরং বলা যায়
ছিল
একটি লোক যে লিখে গেছে এই কথাগুলো পর পর
আগামীকাল আমাদের কবরের উপর ফসল হবে
আরো সুন্দর

বড়ই করুণ
বড়ই শোচনীয়
কারণ এমন নয় মোটেই
যে ফসল জন্মাবেই
যারা প্রাণ হারায় তাদের কবরের উপরে
যাতে ওঠানামা করে
ফসলের দর
এমনকি মগজের কয়লার বা ফুলের দর
তবুও ব্যাঙ্কের ভয়ঙ্কর নোটের উপর
অধিকারীদের নিদারুণ নোটের উপর বল্কান
মাননীয় চিত্রকরদের আঁকা
মুট রঙীন ছবি রঙ পাকা
প্রমের আলা-খরানো মূর্তি
তাতে দেখা যায় মজুরের মূর্তি
সবক্কে রূপ দেওয়া
তার ঠোটে হাসি হাতে যন্ত্রপাতি

ঘাষো কাটো-কাটো বৃকের ছাতি
 গ্রীষ্মের মনোরম ক্ষেত্রে
 সে কসল কাটে গানে যেতে
 কিছু কখনো দেখা যায় না
 বাস্তবের আয়না
 ঘামে-নাওয়া মজুর কসলের মতো কাটা মজুর ক্ষেত্রে
 বড়ই করুণ
 বড়ই শোচনীয়
 শস্ত্রের শীঘ্র বাঁধা হ'য়ে গেছে সারি সারি
 মজুরও
 বড় বড় নোট দিয়ে বড় বড় অধিকারী
 ঠাট্টা জুড়ে কিনেছে তার মাথা
 এবং তার গোটা শরীরটার উপর
 তাদের অধিকার জারী
 আর তার সব বছরের সব কাজের উপর
 সব শীঘ্র বাঁধা হ'য়ে গেছে সারি সারি
 প্রত্যেক শস্ত্রের কণা গোনা
 প্রত্যেক ভক্তি টুকে-নেওয়া
 প্রত্যেক ফুল ছিঁড়ে-তোলা
 কসল ওঠানামা করে
 সেই সঙ্গে টাকা
 সেই সঙ্গে চিনি
 সেই সঙ্গে ইম্পাত
 আর মজুরের হিসেবনিকেশ
 মুনাকার মজুরীতে বেশ
 বিজ্ঞভাবে খেলানো
 বৃক্ক ঘোষণা করা হয়েছে
 সস্তা চাষ-লাগানো
 মাটির উপর
 নিজেদের তৈরি শহরের ধ্বংসের ভিড়

বারিা ছিল সবচেয়ে জোয়ান
 সবচেয়ে জীবন্ত
 সবচেয়ে হাসিখুশি
 হৃদয়ে সবচেয়ে সুন্দর
 তারিা নিশ্চল শুয়ে আছে সম্মানক্ষেত্রের উপর
 মৃত্যুর মুখে মাথা আর
 বন্ধুকে ফুল
 তাদের সরল জীবনের অরপীয় ফুল
 তারও পালা আস্তে আস্তে পচবার
 প্রিয়াদের ফুল বন্ধুদের ফুল ঝার ঝার
 এবং এই সম্মানের ক্ষেত্রের উপর
 সম্মানের এবং মৃনাঝার
 ক্ষেত্রের উপর একটু পরে এই সময়ে সমান করা
 সম্মান-ক্ষেত্রের উপর থাকবার
 একক
 কৃত্রিম ফুল অসার
 অবাস্তব গোলাপ
 বমি পায় এমন ফুল
 টেঁচাতে ইচ্ছে করে এমন ফুল
 অমুক প্রেসিডেন্টের বিধবা সাক্ষী নেই ঝাঁর
 ক্যাকাসে গোলাপী ফুলকপি জবরদস্তি জোড়-লাগানো
 জবর উদ্ভিদ হান্সকর ভাঁড়ানো
 আর একবার
 গারের জোরে
 সাময়িক সঙ্গীতযোগে সাড়ম্বরে
 দেওয়া হল শুঁজে আটকে হল বোলানো
 পৃথিবীর পোশাকের কোকরে
 যে-পৃথিবী ওষ্ঠাগত-প্রাণও
 যে-পৃথিবী নির্জন চরাচরে
 যে-পৃথিবী লুপ্তিত ধিকৃত গোড়ানো

নৈরান্তর তারে নোয়ানো
বাহারে পোশাকে সাজানো ।

অরুণ মিত্র

সংসারে

যবে একলা মা । যবে চোকে ছেলে ; অন্নবরস, ক্যাকাগে, অহির, চুল এলোঝেলো । চুকেই
সে দেয়ালে লুটিয়ে পড়ে ।

ছেলে

এফুনি দরজা বন্ধ কর, মা, পায়ে পড়ি তোমার !

মা মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দরজা বন্ধ কবল ।

মা

(দরজার তাল্লা দিতে দিতে, ছেলের মতই দীর্ঘনিঃশ্বাস কলে)

তাল্লা.. এই দেওয়া হল ! (ছেলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে) দেখুন, ঠিক
ঝড়ের মতন ও চুকল আর চোঁচাতে শুরু করল, আবার কেমন কাঁপছে দেখুন ।

ছেলে

মাগো, তুমি যদি জানতে...

মা

আমি জানি না তবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে...(মিষ্টি হেসে) আবার
নিশ্চয় কিছু একটা বদমাইসি করে এলি !

ছেলে

মাগো !

মা

কেন এই অস্থিরতা, কেন এই উদ্ভিন্ন দৃষ্টি, কি লুকিয়ে রেখেছিল হাতের ওলায় ?

ছেলে

আমার ভাই-এর মাথা, মা ।

মা

(অবাক হয়ে) ভোর ভাই-এর মাথা !

হেলে

আমি ওকে খুন করেছি, মা !

মা

সত্যিই কি এর দরকার ছিল ?

হেলে

(শোকার্তভাবে হাত নেড়ে) আমার চেয়ে ও বুদ্ধিমান ছিল ।

মা

কিছু মনে করিস না । আমি তোকে সাধ্যমত ভালভাবে মাহুষ করেছি । কিন্তু কি আর বলব, তোর বাবা, হায়, সেও তো খুব একটা চালাক ছিল না । (আবার মিষ্টি হেসে) যাক্ মাথাটা দে, আমি ওটাকে লুকিয়ে রাখি...(হেসে) পাড়া পড়শিরা যেন টের না পায় । হিংসার বশে অনেক ব্যাপারে তারা কটাক্ষ করতে পারে.. (মাথাটা নিরীক্ষণ করতে লাগল) ।

হেলে

(যজ্ঞশায় কাতর ভাবে) ওটা দেখো না, মা !

মা

(কঠিন অথচ কোঁতকের সঙ্গে) আমার বড় ছেলের মাথা আমি যদি শেষবাবের মতো না দেখি, তাহলে তার চেয়ে অপূরণীয় ক্ষতি আর কি হতে পারে !... (নরম সুরে) সত্যি, তোকেই আমি বেশি পছন্দ করি, তবু বাড়িয়ে না বললেও বলতে হয় “কর্তব্য করতে হবে ।” (মাথাটা আবার দেখে) আর দেখুন শয়তান-টাকে । সে যে শুধু তাব ভাইকে খুন করেছে তাই নয়, তার চোখ দুটো বন্ধ করে দেওয়ার কষ্টটাও করে নি ! (নিজেই বন্ধ করে) আঃ এই ছেলেগুলো (হেসে) আমি যদি না থাকতাম ! (ভেবে) মনে হয় ভাঁড়ার ঘরের সব-চেয়ে বড় পাখবটার পেছনে...

হেলে

(উদ্বেগের সঙ্গে) ভাঁড়ার ঘরে, তোমার কি সত্যিই ভয় হয় না যে...সত্যিই...

মা

(অভিজ্ঞত না হয়ে) ভয়ের কিছুই নেই : আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তোর বাবাকে খুন করে ঐখানেই আমি তার মাথাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম ।

হেলে

! ! !

মা

হঁ, তখন আমার বরস অন্ন, প্রেমে পাগল ; হেসে বেড়াতাম, নেচে বেড়াতাম
...(সে হাসল) হায়রে যৌবন, উন্মাদনা, অবাস্তবতা । (বেরিয়ে যেতে
যেতে) একুণি আসছি...তুই খাবার টেবিল সাজা ।

ছেলে

আচ্ছা মা ।

মা

(চৌকাঠ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) আর খডটা ? খডটাকে নিয়ে কি করলি ?

ছেলে

(একটু ইতস্তত করে) খডটা ? ওটা এখনও ছুটে বেড়াচ্ছে...

মা

হায়রে যৌবন । সবাই একই রকম...সবাই বাইরে ছুটে চলেছে, তিড়িং তিড়িং
করে নেচে চলেছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে...

মা বেরিয়ে যায় । ছেলে একাকী ঘরে খাবার টেবিল সাজাতে থাকে । হঠাৎ দরজার টোকা ।

ছেলে

???

আবার টোকা ।

ছেলে

(উদ্ভিন্ন ভাবে) কে ? (কোনো উত্তর নেই, কিন্তু আবার টোকা) কে
ওখানে ? (টোকা বেড়েই চলে কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া যায় না) ।

কেউ একজন টোকা দিচ্ছে, জিগোস করছি, অথচ কেউ উত্তর দিচ্ছে না...
এক অমোঘ শক্তি আমাকে দরজার খিল খুলতে বাধ্য করছে...

সে এগিয়ে গিয়ে খিল খুলল আর ভয়ে পেছিয়ে এল । কান্নার প্রবেশ । মুগ্ধহীন এক
যুবকের দেহ, সে অনেক ছুটেছে আব হাঁপাচ্ছে । ছেলে কিছু বলে না, কিন্তু খুব বিরক্তভাবে
তার ভাইয়ের দেহটা দেখতে থাকে, দেহটা স্পষ্টতই খুব বিক্ষলভাবে ঘরের মধ্যে পারচারি
করতে থাকে ।

ছেলে

বোস...(সে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল কিন্তু অন্য জন স্বভাবত তা দেখতে
পেল না) । সত্যিই...(গভীর দীর্ঘশ্বাস)

মা

(ক্ষত, উৎফুল্লভাবে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) থাক...সব ঠিক...(হঠাৎ তার

নজর পড়ল পায়চারি-করা মুণ্ডহীন ছেলের উপর)। আরে ! এই তো তুই ! সত্যিই তুই সুন্দর । (কথা বলতে বলতে সে টেবিলের উপর খাবারের স্টেট পাতড়ে লাগল) এই রকম অবস্থায় কেলার হৃদয় কান্নাও হয় ! তার ওপর হাঁপাচ্ছে । হয়েছে... (সে স্নেহভরে তার হাত ধরল), আর সুপ খাবি আর... (অপর ছেলেকে) আর তুইও, (স্নেহের সঙ্গে, সজ্বরভাবে) শোন, আশা করি তোরা আর ঝগড়া করবি না ? ঝাক, হাতে হাত দিয়ে ভাব কর ।

ছেলে

কিন্তু, মা !

মা

আমার কথা শুনছিস ?

ছেলে

হ্যাঁ মা ।

সে কোমলভাবে তার মুণ্ডহীন ভাইয়ের হাত ধরে এবং তা ঝাকাতে থাকে ।

আমার ওপর রাগ করিস না...রাগের বশে আমি এ কাজ করেছি ।...

মা

ঝাক, শেষ পর্যন্ত মিটমাট হল (ছেলেদের দিকে গভীর স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে) কিন্তু এটাই সব নয়, তোর সুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে...

ছেলে

দুপ খেতে খেতে বঠাং খেয়ে গিয়ে, খিদে যেন মরে গেছে

কিন্তু মা !... (মুণ্ডহীন ভাইকে দেখিয়ে) ও তো খেতে পারবে না... (সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাতে লাগল) ওর সুপ !...

মা

(রেগে গিয়ে) বাকি ছিল এটাই । (তারপর সুন্দর হেসে) বা, কানেল নিয়ে আর...

ছেলে

কানেল, মা ?...

মা

হ্যাঁ, পাঠা কোথাকার... (সে সুপটা ছেলের মুণ্ডহীন খড়ের “মাথার” ওপর ঢেলে দেবার যতন করে দেখাল ।) হাজার হোক, এটা কোনো জাহ্ন নয়... (কষ্টের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে) সত্যিই, অনেক খেঁষ খেঁষেছি, এমন

অনেক সময় আসে (আরও কষ্টের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে) যখন প্রশ্ন জাগে যে, ভগবানের কাছে আমি এমন কি করেছি যাতে আমার এই রকম ছেলে হোল ?...

যবনিকা

গোলক গুহ

দেশে কেবা

ব্রিটানির একটা লোক বেশ কয়েকটা কেলিংকারি ক'বে

জন্মভূমিতে ফিবে আসে

দুয়ারুননে-ব কারখানার সামনে সে ঘুবে বেড়ায়

কাউকে আর সে চিনতে পারে না

কেউ আর তাকে চিনতে পাবে না

সে খুবই মনমরা হয়ে পড়ে ।

ক্রেপ-পিঠের দোকানে সে ক্রেপ খেতে ঢোকে

কিন্তু সে খেতে পাবে না

কি একটা ক্রেপগুলোকে তার গলায় আটকে রাগে

সে দাঁম মিটিয়ে দেয়

বেরিয়ে পড়ে

একটা সিগারেট ধরায়

কিন্তু সিগারেটটা খেতে পাবে না ।

কি একটা

কি একটা তার মাথার ভেতর

কিছু একটা খারাপ

ক্রমশ সে আরো মনমরা হয়ে পড়ে

আর হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় :

যখন সে ছোট ছিল কেউ একটা তাকে বলেছিল

‘তোমার জীবন শেষ হবে ফাঁসিকাঠে’

আর বছরের পর বছর

কখনো সে কিছুই করতে সাহস পায় নি

এমন কি রাস্তা পেরোতেও নয়

এমন কি সাগর পাড়ি দিতেও নয়

কিছুই নয় একেবারে কিছুই নয় ।

তার মনে পড়ে যায় ।

যে তাকে সব জানিয়ে দিয়েছিল সে হোল গ্রেজিয়ার খুডো

যে গ্রেজিয়ার খুডো সবার দুর্ভাগ্য ডেকে আনত

বদমাস !

আর ব্রিটানির লোকটা তার বোনেব কথা ভাবল

যে বোন ভোজিরার-এ কাজ করে

তার যুদ্ধে মারা যাওয়া ভাইয়ের কথা ভাবল

বিবগ্নত। তাকে আঁকড়ে ধরে

যা কিছু সে দেখেছে

যা কিছু সে করেছে সবকিছুব কথা ভাবল

আরেকবার সে চেষ্টা করল

একটা সিগারেট ধরাতে

কিন্তু সিগারেট খেতে তার ইচ্ছে হোল না

তখন গ্রেজিয়ার খুডোর সঙ্গে সে দেখা করবে স্থির কবল

সে গেল

দরজা খুলল

খুডো তাকে চিনতে পারে না

কিন্তু সে ওকে চিনতে পারে

আর ওকে বলে :

‘নমস্কার গ্রেজিয়ার খুডো’

আর তারপর সে খুডোর ঘাড় মটকাষ ।

আর দু-ডজন ফ্রেপ

আর একটা সিগারেট পেয়ে

ক্যাপে-র ফাঁসিকাঠে সে জীবন শেষ করে ।

শ্রব দাশগুপ্ত

মাহুৰ

মাহুৰগুলো

মাহুৰটি বলল

ওরা দৃঢ়পায়ে চলে আর আমিও ওদের সঙ্গে রয়েছি

তবু মাহুৰ এত দুর্বল

ঐ লোকটাকে দেখ

ও একটা জানলা খুলল

ও ঝুঁকে পড়ল

ও আবার জানলা বন্ধ করে দিল

ও বাইবে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল

ও বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল না

আর ঐ আরেকজন লোক একজন ট্রাক বন্ধ করল

ঐ ট্রাকে আছে কিছু একটা

বা বলা যায় কেউ একটা আছে যে বেঁচে ছিল

আবার ঐ যে লোকটা একটি মেয়ের হাত ধবে রাস্তা পাব হচ্ছে

ওর দিকে তাকাও

মেয়েটির দিকে তাকাও

দেখ কি দ্রুতবেগে গাড়িটা যাচ্ছে

গাড়ি যাচ্ছিল দুর্ঘটনা ঘটল চিংকার শোনা গেল

মেয়েটি মুহূর্তের জন্তু শূন্যে উড়ল পরক্ষণেই পড়ে গেল

রক্তাক্ত উন্মুক্ত বিবস্ত্র চুরমার ওর দেহ

লোকটির দিকে তাকাও

ও যেন জমে গিয়েছে

নিম্পৃহ উদাসীন ও

ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না

ও পালিয়ে গেছে অস্ত্র কোথাও

আশ্রয় নিয়েছে

সম্পূর্ণ উদাসীন করেকটি মুহূর্ত

দুঃখকষ্টের হিসেব নেবার আগে করেকটি মুহূর্তের অবকাশ

ভাষ্যপন্ন নিজেব চেতনাৰ ক্বিৰে এসে ওষেয়েটিৰ কাছে আসে, ও কাঁদে হাহাকার
কৰে, ডাক্তার কোথায় বলে আৰ্ত্তনাদ কৰে দৈবৰেৰ কাছে মিনতি জানায়
দুঃখের অলুভুতিকে ও লালন কৰে
ওৰ সঙ্গিনী বস্ত্ৰেৰ মধ্যে ভাসছে
আৰ ও নিজেৰে বলছে
এখন আমাৰ কি হবে

কিন্তু ওৰ বেদনাই ওকে সাধনা দেয় আৰ ওকে বলে
আমি যা তাব চেয়ে আমাকে বড কৰে তুলো না
যুদ্ধকৰ্ণে ওকে আরো বলে
সত্যি কৰে বলতো তাকে কি তুমি এতই ভালবাসতে ?

সুদেবী চৰিত্ৰ

আমেরিকার অভ্যন্তর

আন্তোনিয়' বেক'লকাতিৰ জগত

নিউ ইয়র্ক

নগরের ওপৰ দ্বিষে সময় বৰে যাচ্ছে—ইঠাং যেন সময় থেমে যায়—এক
চিহ্নকরের ঘৰে কয়েক মাসের জন্ত থেমে থাকে।

ইয়া, বেশ কিছুক্ষণেব জন্ত সময় থেমে যায়—চিহ্নকরের সঙ্গী হয়ে থাকে।

আৰ এই চিহ্নকর বাইরে যেতে পারে না—অথবা খুব কদাচিৎ হয়ত যায়।

তার নিজের কোন সময় নেই, তার সমস্ত সময় এখন কাটে এই ঘরটির
দেয়ালে ছবি আঁকায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অথচ এই ঘরটি, তা যে তলায় হোক না কেন, এটা বিদ্যমানের ভাষায়
এমন উচ্চস্থান নয় যেখানে শুধুই বুদ্ধির খেলা চলে, আবার এ মিমি প্যাসৌর
ধাক্কাৰ মত বা ব্লাকসিৰিজের ওপর তলায় কুঠুরি নয়, আবার গ্রীনউইচ
ভিলেজের সুন্দর সাজানো ওপরের ঘরও নয়—সোজা কথায় নির্মম সভ্যের
ভাষায় বলতে গেলে এ এমনই একটি ঘর যার স্বস্তিদায়ক উগ্র সাধারণত্বের সঙ্গে
চিহ্নকরের বোঝাপড়া করতে হবে। এই ঘরের চার দেয়াল তার চারদিকে

দাঁড়িয়ে আছে, চিন্তিত সচেতন বিজ্ঞানী লোকের মাথার চুল যেমন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; এই চার দেয়ালের প্রত্যেকের সত্য আলাদা, এই চারটি সত্য কথা না বলে সে এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না ।

চিত্রকর ঘরের ভেতরে থাকে, জানলাগুলো—বা জানলাটি, ঘরে যদি একটিই জানলা থাকে—না খুলে ।

বাইরে—সে চেনে ।

কি লাভ আবিষ্কার করে—অবনত সূর্যের আলোর আর ধুলোব জর্জরিত মরচে ধরা তামার মতন সবুজ রঙের এই একটুকরো জমি, এই নগরের দীপ্ত আলোগুলি যা কলরবে মলিন হয়ে মুছে গিয়েছে ।

বাঞ্জির অসহ্য মধুর জীর্ণ সন্ধ্যার কথাও সে জানে—যখন সব রাস্তা হয়ে যায় কানা গলি, যেখানে প্রতিকারহীন দুঃখের মুখোশপরা কোন নেশাখোর তার নেশাভঙ্গের অস্থিরতার আক্রোশের ছুরি তোমার গলার নিচে বা পিস্তল পেটের ওপর ধরে—“দয়া করতেই হবে, পছন্দ না হলেও দয়া করতেই হবে, নয়ত আমার এই তৈরি করা স্বপ্ন কুকুরের চেয়েও হীনভাবে মরে যাবে ।”

চিত্রকর যার নাম আন্তোনিয়ো রেকালকাতি, কেননা সে ইতালিতে জন্মেছিল, অল্প দেশের শ্রান্তি ও অবসাদের মালমশলায় গড়া বাড়ি ও ঘরগুলোর কথাও জানে, সে জানে আজকের দিনে সমস্ত জগত পৃথিবীকে তিন ভাগে বিভক্ত ক’রে দেখে, পৃথিবী থেকে যে মুখ লুকিয়ে আছে, বক্তব্য মুখ, হত্যার মুখ, যুদ্ধ ও হানাহানির মুখ ।

আর সে যদি টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের ঘোষণাগুলি শোনে—“কাল আপনি হবেন কোকা—কাল আপনি হবেন কোলা”, সে বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলে, “কাল আপনি হবেন নেপাম”, এই বলে সে স্নুইচ ঘুরিয়ে দেয় ।

কিন্তু যখন সে চিত্রের মধ্যে দ্বিয়ে ভিয়েতনামের কথা ফুটিয়ে তোলে, সে কখনও অল্পদের মতন তার ছবির ক্যানভাসকে মলোটোভ ককটেল বলে ভুল করে না বা তার ইজেনকে ব্যারিকেড মনে করে না । আর যখন সে নিজস্ব সত্তার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ যে সত্তাকে লোকে বলবে “সে”, আর সে নিজে বলবে “এই আমি”—ভীত হিংসা ও ঘৃণায় ভরা ঔদাসীন্ডের সঙ্গে জীবনের ধ্বংসের চিত্র আঁকে, তখন সে নিজের সঙ্গে এই গোপনে কথা বলাবলিতে সানন্দে বাধা দেয় । চিত্রিত সেই ঘরে আসবাবপত্রের বসবার চেয়ার ডিভান সবকিছুতেই একটি স্থল্লর যুবকের সমস্তায পীড়িত হয়ে উদ্বেগের বিচারকের কাছে নিজের

দোবের স্বীকারোক্তির পরিচয় আর পাওয়া যায় না, শুধু পাওয়া যায় উজ্জল
 দিবালোকে বা স্তম্ভ মধ্যরাতে বেছে বেছে, আত্মায় আত্মায়, রক্তের কণার
 কণার প্রেমের মিলনের চিত্র। চিত্রকলার বা যে কোনো ভাবের প্রেমের
 পরিচয় প্রেম, প্রেমের উত্তর প্রেম।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

পিকাসোর ব্যাজিক লর্ডন

একটি নারীর সবকটা চোখ একই ছবিতে চঞ্চল
 নোংরা রঙচঙে কাগজের একটা স্থির ফুলের তলায় ভাগ্যভাঙিত প্রিয়জনের
 আদল

ঢেয়ালের অরণ্যে খুনের সাদা ঘাস
 খেতপাথরের একটা টেবিলের ওপর এফোড় এফোড় এক পিচবোর্ডের ভিথিরি
 একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা চুরুটের ছাই
 একটা প্রতিকৃতির প্রতিকৃতি
 একটা শিশুর গোপন রহস্য
 রান্নাঘরের সিন্ধুর অনস্বীকার্য দীপ্তি
 হাওয়ায় একটুকরো শ্যাকড়ার তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য
 পাখির চাউনিতে ফাঁদের উন্মাদ আভাস
 সেলাই ফেসে যাওয়া একটা ঘোড়ার কিছুত হ্রোম
 ঘণ্টা-বাঁধা গজরগুলির অসম্ভাব্য সংগীত
 টুপির মুকুট পবানো নিহত বাঁড
 যুমন্ত লালচুল একটা মেয়ের তুলনাবিহীন পা আর তার এতটুকু চিন্তার
 এই বড় কান

হাসি দিয়ে খাবে ফুলের চিত্রের পর্দা

সৈকত লবণের একটা কণার বিপুল পাখরের মৃতি

প্রতিটি দিনের আনন্দ আর মরে যাওয়ার অনিশ্চয়তা আর মুহূর্তসিঁরি কতখানে

ভালোবাসার বর্ষাকালক

সবচেয়ে নগণ্য কুকুরটির সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র

আর জানলার কাছে কটির কোমল ঝড় নোনতা

হারিয়ে যাওয়া আর কের খুঁজে পাওয়া আর ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়া

আর কের গড়ে তোলা প্রয়োজনের নীল ছেঁড়া পোষাকে সাজানো ভাগ্যরেখা

চালের পিঠের ওপর একটা মালাগার কিসমিসের অবাক করা আবির্ভাব

খুপরি মধ্যে একটা লোক লাল মদের ঘায়ে দেশের যজ্ঞশালাকে কাবু করে দিচ্ছে

একগোছা মোমবাতির চোখ ধাঁধানো আলো

বিগলকের মতো হাঁ-করা সমুদ্রমুখো একটা জানলা

ঘোড়ার খুর আর একটা বড় ছাতার বালি পা

খুব ঠাণ্ডা এক বাড়ির ভেতর নিঃসঙ্গ একটা ঘুঘুর অতুলনীয় লাষণ্য

ঘড়ির মৃত ওজন আর তার হাবানো মুহূর্তেরা

স্বপ্নচাবী ন্যূন যে মাঝরাতে তক্তাচ্ছন্ন আর হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যকে

আচমকা জাগিয়ে দেয় তার কাঁধে চিমনির ওভারকোট চাপায় আর গীটা

কাগজের পোষাক আব হিম্পানি সাদার মুখোস লাগানো ধোঁয়ার

অঙ্ককারের মধ্যে সঙ্গে করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়

এবং আরো অনেক কিছু

শিল্পের শৈশবকে দোল যাওয়াতে থাকা সবুজ কার্টের একটা গীটার

পোটলাপুটলি সমেত একটা রেলের টিকিট

হাতটা সেই মুখকে বিভ্রান্ত করে যে মুখ একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

আশ্চর্য স্থিতমুখ উৎফুল্ল আর বেহায়া আনকোরা আর নয়

একটি মেয়ের আছরে কাঠবেড়ালি

বোতল রাখার গোপখোপ দ্বাঙ্গ কিংবা বাস্তবজ্ঞের খোপ থেকে জননেদ্রিয়ের

আকার এবং বারংবার গজানো আর সবুজ উদ্ভিদের বর্ষের মতো হঠাৎ

অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসা

যেয়েটিও হঠাৎ অলক্ষ্যে শাস্ত্রসম্মত বিধুর আর হাড় জিরজিরে বড়ো প্রাচীন

শিল্পজীব্যের মতো সুন্দর একটা তালগাছের পচে যাওয়া গুঁড়ি থেকে

বেরিয়ে আসা

ভোরের ফুটির আকার ঘণ্টাগুলো একটি সাহ্য-পত্রিকার চিত্রকারে চুরমার
 একটা বুড়ির ভলা থেকে বেরিয়ে-আসা কাকদার ভয়ংকর দাঁড়াগুলো
 শান্তি পাওয়া আসামীর ছফোটা অশ্রু নিয়ে একটি গাছের শেষ ফুল
 আর দাঁবার গাঢ় লাল ডিভানের ওপর নিঃসঙ্গ আর প্রথম স্বামীদের বিবর্ণ ভীতি
 ঘরা পরিত্যক্ত দারুণ সুন্দরী বধু

আর তারপর শীতের এক বাগানে সিংহাসনের পিঠেব ওপর অস্থির একটা
 মেনীবেড়াল আর এক রাজার নাকের ফুটোর নিচে তার লেজের গোঁফ
 বেতের বুড়ির কাছে বসা এক বুড়ির পাথুরে মুখে দৃষ্টির পাথুরে চুন
 আর বাতিঘরের রেলিঙে সবে লাগানো রেড অক্সাইডের ওপর ঘুরে বেড়ানো
 তাঁড়ের ঠাণ্ডায় কঁকড়ে যাওয়া নীল হাতগুলি সমুদ্রের দিকে তার দৃষ্টি আর
 তার বিরাট ঘোড়াগুলো অন্তগামী স্থালোকে ঘুমন্ত আর তারপর তারা
 জেগে ওঠে তাদের নাসাবন্ধ কেনাঘিত তাদের কসকরাসের ছাতিময় চোখ
 বাতিঘরের দীপ্তিতে এবং তার ভয়ংকর ঘূর্ণায়মান আলোয় ব্যাকুল

একজন ভিথিরির মুখের ভেতর পুরো বলসানো একটা বাবুই
 পার্কের মধ্যে পাগল এক পল্লু বুবতী ছেঁড়া ছেঁড়া যান্ত্রিক হাসি হাসতে হাসতে
 কোলে একটা ঘুমে অসাড় বাচ্চাকে দোল পাওয়াতে খাওয়াতে তার
 নোংরা খালি পা দিয়ে ধুলোর মধ্যে বাপের আদল আর তার হারিয়ে
 যাওয়া চেহারা আঁকে আর ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো নবজাতককে পথচারী-
 দের দেখায় দেখো আমাব পোকামণিকে দেখো আমাব শুক্মণিকে আমার
 সাতবাজার ধন মানিককে আমার নিজের বাচ্চাটিকে একদিকে ও ছেলে
 অত্রদিকে ও মেয়ে প্রতিদিন ভোরে ছেলেটা কাঁদে প্রতিদিন সন্ধ্যার
 মেয়েটাকে শান্ত করি আর ঘড়ির মত ওদেব দয় দিই

আর এছাড়া গোথুলি দেখে মুগ্ধ বাগানের দারওয়ান
 একটা উর্ণায় ঝুলে থাকা একটা মাকডসাব জীবন
 ভাঙা দোলকওয়ানা একটা পুতুলের অনিদ্ৰা আর চিরকালের জন্ত খোলা তার
 বড় বড় কাচের চোখ
 একটা সাধা বোডার মৃত্যু একটা চড়ুইয়ের ঘোবন
 পৌ-দ-লোদী সডকে একটা স্থলের দরজা
 আর ষার নামে তাদের নাম সেই ছোট্ট বাস্তব একটা বাড়ির লোহার
 রেলিঙে মহান অগাস্টিনরা বিদ্ব

একটি মাত্র মাছকে ঘিরে অঁতিবের সমস্ত জেলেরা
 একটা ডিমের প্রচণ্ডতা আর একটা সৈনিকের কষ্ট
 পাপোষের তলায় লুকিয়ে রাখা একটা চাবির তুলতে না পারা অস্তিত্ব
 আর ভীষণ মোটা একটা মানব-প্রতিমের দৃশ্য এবং সুডোল হাতে ধাক্কা
 আর মৃত্যুর রেখা আর যুদ্ধের সম্মান ও বিভীষিকার সংগ্রহশালাব বিরাট
 যুদ্ধাময় কুলবারান্দার ওপর চোপে পড়ার মত নিশান এবং অমকালোভাবে
 পতাকার মত উত্তোলিত স্বস্তিকাকার ক্রুসিক্সগুলির পেছনে সতর্কভাবে
 আডাল করা এবং প্রলাপ বকতে থাকা পাটো দুটি-পা আর লম্বা উল্লসিত
 নিয়ে জীবন্ত হাশুকার মূর্তি অথচ মহানায়কের যুগ্মহাসিটুকু সবেও তার
 বিবর্ণ এবং লালচে-হলুদ মাংসের মুখোসের ওপর রাতেব প্রশ্রাবাগারের
 সব দেয়ালে হতভাগা নতুন যুগের নিপীড়নকাবীদের লেখা অল্লীল লিপির
 মত খোদিত ভয় অবসাদ ঘৃণা আর নিরুদ্ভিতার অনিবার্য এবং শোচনীয়
 ছাপ লুকোতে অসমর্থ
 আর তাব পেছনে একটুখানি ফাঁক করা কূটনৈতিক ডাকের থলির শব্দগারে
 টাঁদির নিরুত্তর লোকগুলোর স্বর্ণপিণ্ডের আঘাতে ক্ষেতের মধ্যে হঠাৎ
 আক্রান্ত এক চাষীর মৃতদেহ
 আর পাশেই টেবিলের ওপর পেটের মধ্যে গোটা একটা সহর নিয়ে ইঁ-করা
 গেনেড
 আর শুঁড়িরে দেওয়া আর রক্ত শুবে নেওয়া ঐ সহরের ব্যাপা
 একটা স্ট্রচার ঘিরে ঘোড়সওয়ার সমস্ত বক্ষীবাহিনীর লক্ষ্যবিন্দু
 সেখানে একটা মৃত জিপসি এখনো স্থপ্ন দেখে
 আব প্রেমিক কর্মঠ নিশ্চিন্ত এবং চমৎকার এক মানবগোষ্ঠীর সমস্ত রাগ হঠাৎ
 চোখের সামনে জবাই করা একটা মোরগের রক্তিম আর্তনাদের মতো
 কেটে পড়ে
 আর নিরবেতনের মাহুঘের সৌব সর্গালী যা অমিক-সদনের রক্তাক্ত নাড়িভূড়ি
 থেকে রক্তাক্ত উদ্গত হয হাতের ডগায় ধরা কঠোর মলিন দীপ্তি গের্নিকার
 রক্তাক্ত প্রদীপ আর তার রূঢ় এবং বাস্তব আলোর দারুণ উজ্জলতার
 আবিষ্কার করে ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ মজ্জা অবধি ফাঁপা রঙচটা একটা
 জগতের বীভৎস নকল রঙগুলি
 যে জগৎটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা গেল

যে জগৎ দণ্ডিত

আর ইতিমধ্যে বিশ্বত

জনশ্রোতে প্রবাহিত জলের হাজার আঙনে ডুবে যাওয়া অন্ধার হয়ে যাওয়া

যেখানে গগনরক্ত ছুটে চলে অপ্রাস্তভাবে

অনিবার্যভাবে

পৃথিবীর ধমনিতে ধমনিতে আর শিরায় শিরায় আর তার সত্যিকারের সন্তান-

দের ধমনিতে ধমনিতে আর শিরায় শিরায়

আর শুধু একটুকরো সাদা কাগজে আঁকা তার যে কোন সন্তানের মুখ

আঁজ্রে ব্রতৌর মুখ পল এলুম্বারের মুখ

রাস্তায় চোখে পড়া কোন ঠেলাওয়ালার মুখ

প্রিমরোজ-ওয়ালার চোখের ইশারার আভা

চেস্টনাটকলের ভাস্করের বিকশিত হাসি

আর একটা ইত্থির পাশে দাঁড়ানো একজন প্লাস্টাবের মেমপালকের হাতে

প্লাস্টারের মধ্যে খোদাই করা কোচকানো একটা সত্যিকারের ব্যা ব্যা করা

প্লাস্টারের ভেড়া

একটা খালি চুরুটের বাস্কের পাশে

ভুলে ফেলে যাওয়া একটা পেন্সিলের পাশে

ওভিদের মেটামরফসিসের পাশে

একটা জুতোর ফিডের পাশে

অনেক বছরের ক্লাস্তিতে পা-কাটা একটা আরামকেদারার পাশে

দরজার একটা কলিংবেলের পাশে

একটা স্টিললাইকের পাশে যাতে একটা ঠিকে ঝির শিশুশূলভ স্বপ্নগুলি জলন্ত

হুড়ির ওপর হাঁপধরা মরোমবো মাছগুলির মতো একটা বেসিনের ঠাণ্ডা

পাথরের ওপর মুমূর্ষু

আর নিরাশ সেই ঠিকেঝির মরা মাছের আর্তনাদে বাড়িটা আগাগোড়া

আন্দোলিত হঠাৎ যে ঝি নৌকাডুবিতে পড়ে সেন নদীর ঢেউয়ের আঘাতে

উর্ধ্ব উত্তোলিত আর ভের-গাল'র বাগানে করুণভাবে সেনের কূলে

আছড়ে পড়তে যাচ্ছে

আর সেখানে হতবুদ্ধি ঝিটা একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে

আর সে তার হিসেব নিকেশ করে

আর নিজেকে তার পুরনো দিনের স্বভিভে পচে গলে সাধা আর গবের মতো
 ছিন্নমূল বলে মনে হয় না
 একটিমাত্র বর তার রয়েছে একটা শোবার বর
 আর কিছুটা সময় পাওয়ার জন্য ওটাকে নিয়ে যেই সে হেড টেল করতে বাবে
 তে কোনো আয়নার মধ্যে ভীষণ ঝড় সৃষ্টি হয়
 সঙ্গে বেঁচে থাকার আনন্দের সবকিছু শিখা
 জৈব উদ্ভাপের সবকিছু বিদ্যুৎ-চমক
 খোশ মেজাজের সবটা আভা
 আর বিপর্যস্ত বাড়িটাকে চূড়ান্ত বা দিয়ে
 শোবার ঘরের পর্দাগুলো জালিয়ে দেয়
 আর চাদরগুলোকে বিছানার পায়ের দিকে আগুনের গোলার আকারে গড়িয়ে
 দিয়ে
 স্মিত হেসে সমস্ত জগতের সামনে উন্মোচিত করে
 সবকিছু টুকরো সমেত প্রেমের ধাঁধা
 তার সবকিছু বাছাই করা টুকরো পিকাসোর বাছাই করা
 একজন প্রেমিক তার প্রেমিকা আর ওর দুপা তার কাঁধে
 তার দৃষ্টি পাছায় আর হাত প্রায় সর্বত্র
 পায়ের পাতা দুটো আকাশের দিকে তোলা আর উঠাল পাখাল স্তন
 দুটি শরীর আলিঙ্গনবদ্ধ পান্টাপান্ট করা সোহাগ করা
 ছিন্নমূল আর উৎফুল্ল ভালোবাসা
 পরিত্যক্ত মাথা গালিচার ওপর গড়াতে থাকা
 কেলে দেওয়া তুলে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া ভাবনাগুলি
 আনন্দ আর সুখের দ্বারা ক্ষতি করার ক্ষমতা লোপ করে দেওয়া
 রাগত ভাবনাগুলি রাগরঞ্জিত ভালোবাসার দ্বারা হতবুদ্ধি
 মাটিতে কেলে দেওয়া আর মাটিতে ঢাকা ভাবনাগুলি ভালোবাসার প্রচণ্ড
 জাহাজডুবি আসছে বুঝে মৃত্যুর হতভাগ্য ইহুদীদের মত
 ঘরের দরজার কটির পাশে জুতোর পাশে স্বহানে পুনঃস্থাপিত ভাবনাগুলি
 পুড়ে থাকে লাগিয়ে পার হওয়া বিলুপ্ত করে দেওয়া আদর্শমূল্য ভাবনাগুলি
 অমূল্য এক জগতের আশ্চর্য উদাসীনতার সামনে প্রস্তরীভূত ভাবনাগুলি
 যে জগৎ কের ঘুঁজে পাওয়া

যে জগৎ অনস্বীকার্য আর অব্যাখ্যাত
যে জগৎ শিষ্টাচারশূন্য অথচ বীচার আনন্দে পূর্ণ
যে জগৎ সংঘর্ষী আর মাতাল
যে জগৎ বিয়ল্ল আর আনন্দিত
কোমল আর হিংস্র
বাস্তব আর পরাবাস্তব
ভয়ংকর আর মজাদার
রাত্রিকালীন আর দিবাকালীন
স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক
দারুণ সুন্দর

১২৪৪

পুঙ্খর দাশগুপ্ত



সত্যজিৎ

রনে শারের কবিতা ।

রনে শার

বজ্রণা, বিস্ফোরণ, নীরবতা

কালার্ডের জাঁতাকল। ছ'বছর ধরে গন্ধাকড়িঙের খামার, বাবুইয়ের কেলা। এখানে সব কিছুই কথা বলতে শোতে, কখনো হাসি দিয়ে, কখনো ঘোবনেব মৃতি দিয়ে। আজ সে প্রাচীন বিদ্রোহী জীর্ণ হয়ে পড়েছে তার পাথরগুলোর মধ্যে, যারা বেশিরভাগই হিমে, নিঃশব্দতায়, উত্তাপে মৃত। আর ভবিষ্যতের আভাসগুলো ফুলের নিঃশব্দতায় ঝিমিয়ে পড়েছে।

রকে বেরনাব : দানবদের দিগন্ত তার বাসভূমির অত্যন্ত নিকটে ছিল।

পাহাড়ের মধ্যে খুঁজো না ; কিন্তু যদি সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অপদেং-এর গিরিবন্ধে পড়ুয়ার মুখওয়ালা কোন বজ্রের সাক্ষাৎ পাও তাহলে তাব কাছে এগিয়ে যেও, হ্যাঁ, তার কাছে এগিয়ে যেও, তার দিকে তাকিয়ে হেসো কারণ সে নিশ্চয় ক্ষুধায় জর্জর, বজুত্বের ক্ষুধায়।

অকণ মিত্র

বলো

বলো আঙুন যা বলতে দ্বিধা করে
বায়ুগুলোর সূর্য, সাহসী আলো,
এবং মরো সবার জন্তে তা বলেছ ব'লে।

অকণ মিত্র

বাতাসকে বিদায়

গ্রামের টিলার গায়ে মিমোজা ভরা মাঠগুলো বাত কাটায়। ফুল ভোলাব মরুত্বে তাদের জায়গা থেকে দূরে এক মেয়ের সঙ্গে অতি স্নেহ সাক্ষাৎ ঘটে গেল, এমন হয়। সে-মেয়েব হাতদুটো সারাদিন ভক্ত শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত ছিল। স্মৃতি যার জ্যোতির্বলয় এমন এক প্রদীপের মতো সে অজ্ঞানী সূর্যের দিকে পিঠ ক'রে চলে যায়।

তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে পবিত্রতাকে অপমান করা হবে।

পাছুকায় বাস মাড়াতে মাড়াতে তার পথ ছেড়ে দিহো। হয়তো
সৌভাগ্যক্রমে দেখতে পাবে তার ওঠে রাজির আত্মতার মৃগভূষা

অরুণ মিত্র

ওদের আবার দাও

ওদের মধ্যে যা আর বর্তমান নেই তা আবার ওদের দাও,
ওরা আবার দেখবে ফসলের দানা মঞ্জুরীর ভিতরে বন্ধ হচ্ছে

এবং বাসের উপর নড়াচড়া করছে।

পতন থেকে উৎসার পর্যন্ত ওদের মুপের বাবো মাস ওদের শেখাও,
ওরা ওদের হৃদয়ের শূন্যতাকে লালন করবে আগামী বাসনা পর্যন্ত;
কেননা কোনো কিছুবই ভরাডুবি ঘটে না, কোনো কিছুই ভ্রমের

জন্তে উন্মুখ হয় না;

এবং যে দেখতে জানে কেমন ক'রে মাটির পরিণতি হয় ফলে,
সর্বশাস্ত হ'য়েও কখনো সে বিচলিত হয় না।

অরুণ মিত্র

ছটি

গোলাপগাছ, কেন তুমি তোমার দুই গোলাপ নিয়ে

দীর্ঘ বারিধারায় ছলে ছলে ভাব ঠিক রাখো?

দুটি পাকা বোলতাব মতো তারা না উড়ে ব'সে থাকে।

আমি তাদের দেখি আমার হৃদয় দিখে, কেননা আমার চোখ বন্ধ

ফুল ছাডিয়ে উপরে আমার ভালোবাসা রেখে গেছে

শুধু হাওয়া আর মেঘ।

অরুণ মিত্র

চৌকাঠ

দৈবের আত্মসমর্পণের বিরাট ফাটলটার হু-হু শোষণে যখন কেঁপে উঠল মাহুকের বাঁধ, তখন যে-শব্দগুলি দূরে-দূরে ছিল ও যারা হারাতে চায়নি, তারা কণ্ঠে দাঁড়ালো সেই প্রবল ধাক্কা সামলাতে। সেখানে নিরুপিত হল তাদের অর্ধের বংশক্রম।

আমি ছুটলাম মহাপ্রাণবানী এই রাত্রির শেষ পর্যন্ত। এখন হে আমার বন্ধুগণ যারা আসছে, আমি অপেক্ষা করছি তোমাদের, কম্পমান প্রত্যাশে প্রোথিত হয়ে, আমার কটিবন্ধ ভরে ঋতুর দল। আন্দাজও পাচ্ছি তোমাদের, ইতিমধ্যেই, মসীমাখা দিগন্তের ওপার থেকে। তোমাদের গৃহের শুভকামনায় আমাব চুল্লীতে আঁচ সমানই থাকছে। এবং তোমাদেরই জন্তু এই প্রাণ খুলে হাসে আমার দেওদাবের যষ্টি।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

এক ছাংখে আমার বাস

শরতের জ্ঞাতি ঐ মেহগুলির হাতে ছেড়ে দিও না তোমার জন্মের চালনার ভার, যে-শরতেরই ধীরস্বস্থ গতি ও শিষ্টাচারী মনঃক্লেশ ওরা ধার করেছে। চোখ তুলতুলু হয় সহজেই। যন্ত্রণা চেনে কম শব্দ। শোও বরং বোঝা ছাড়া : স্বপ্ন দেখবে আগামীকালের এবং হালকা ঠেকবে শয্যা তোমার। স্বপ্ন দেখবে, তোমার গৃহের জানালায় আর কাচ নেই। বাতাসের সঙ্গে মিলতে চেয়ে তুমি অধীর, যে-বাতাস একটি বছর পেরোয় এক রাত্রিতে। সুরেল সংমিশ্রণের গান ধরবে অস্ত্রেরা, সেই মাংসেরা যাতে মৃত আজ মাত্র বালুকা-ঘড়ির মোহিনীশক্তিই। বারবার যা কৃতজ্ঞ করায়, তার নিন্দা তুমি করবে। পরে, লোকে তোমায় সনাক্ত করবে চূর্ণ-বিচূর্ণ কোনো সেই দৈত্য বলে, যে অসম্ভবের অধীশ্বর।

তবু।

তোমার রাত্রির ভারই শুধু বাড়ালে। ফিরলে তুমি প্রাচীরে মাছ ধরতে, ফিরলে বছরের এমন তপ্ততম দিনে যা গ্রীষ্মহীন। যে-মনের মিলটা নিজেই পাগল হতে চলেছে, তার মাঝখানে পড়ে তোমাব প্রেমের বিরুদ্ধে তুমি খাপ্পা।

ভাবো এমন নির্মূল্য বাড়ির কথা যার ভিত্তি উঠতে নিজে কখনো দেখবে না।
কবে হবে পাতালের কসল তোলার দিন? কিন্তু তুমি সিংহের চোখ ছুটো
গেলে দিলে। কৃষ্ণ ল্যাভেণ্ডারের উপর দিয়ে সৌন্দর্যকে চলে যেতে দেখছ
বলে ভাবছ...

আবার কে তোমায় ঠেলে তুলল, আরো একটু উপরে, এবং তবু ঘুচল না
তোমার সন্দেহ?

পবিত্র আসন কোথাও নেই।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

উদ্ভাবকেরা

ওরা এল, আরেক উৎরাই থেকে বনবক্ষীবা, আমাদের অপরিচিত, আমাদের
আচার-আচরণের বিরোধী।

ওরা এল অগণন।

পুনবায় জলসিক্ত এবং সবুজ পুরনো ফসলের খেত

আর দেবদারু গাছগুলির সীমারেখায় ওদের দলকে দেখা গেল।

দীর্ঘ পদযাত্রা ওদের উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

ওদের টুপিগুলো চোখের ওপর এলিয়ে পড়েছিল আর ওদের শ্রান্ত পা পড়ছিল
এলোপাখাড়ি।

আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা থামল।

বোঝা যায় ওরা ভাবতে পারে নি ওখানে আমাদের দেখতে পাবে,

অনায়াস ভূমি আর ঘন-সংবদ্ধ হলরেখার ওপর,

দর্শকদের প্রতি একেবারে ক্রম্বেপহীন।

আমরা মাথা তুলে ওদের উৎসাহ দিলাম।

সবচেয়ে বাকপটু লোকটা কাছে এগিয়ে এল, তারপর ঠিক তেমনি ছিন্নমূল
আর মছরগতি দ্বিতীয় একজন

তোমাদের চিরশত্রু, ঘূর্ণিঝড়ের আসন্ন আবির্ভাবের সংবাদ তোমাদের জানাতে
আমরা এসেছি, বলল ওরা।

পিতৃপুরুষের বচন আর নানান বিবরণ ছাড়া আর কোনভাবেই তাকে
আমরা তোমাদের চেয়ে ভালোভাবে চিনি না।

তবু তোমাদের সামনে কেন যে আমরা অবোধ্যভাবে উল্লসিত আর সহসা
শিশুদের মত ?

আমরা ধৃত্ববাদ জানিয়ে ওদেব বিদায় দিলাম।

তবে তার আগে, ওরা মদ খেল, আব ওদেব হাত কাপতে লাগল, আর ওদেব
চোপ গেলসেব কানায় হাসতে থাকল।

কুঠাব আর গাছের মানুষগুলি, কোনো একটা আতংকের মুখোমুখি হতে
সক্ষম, কিন্তু জলশ্রোতকে বইয়ে নিয়ে যেতে, ঘডবাড়ির সাবি গড়ে
তুলতে কি তাতে মনভোলানো বড়ো আন্তর লাগাতে অপারগ।

শীতের বাগান আর আনন্দেব সঞ্চয় ওদেব অজ্ঞাত।

অবশ্যই আমরা ওদের বুঝিয়ে শ্রুতিয়ে বশ করতে পারতাম।

কেননা ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা মর্মস্পর্শী।

হ্যাঁ, শীঘ্রই ঘূর্ণিঝড় আসছিল,

তবে তা নিয়ে কথা বলে ভবিষ্যতকে উপদ্রুত করার কি তেমন একটা দবকাব
ছিল ?

যেখানে আমাদের বসতি, সেখানে জরুরী ভয় বলে কিছুই নেই।

পুরুষ দাশগুপ্ত

কবির

নিরক্ষরের বেদনা বোতলের অঙ্ককাবে

শকট-নির্মাতার অলক্ষ্য অস্বস্তি

তামার পয়সা গভীর পাত্রে

লোহার পাতের ভোঙাষ

জীবন কাটায় নিঃসঙ্গ কবি

বাদ্যার প্রকাণ্ড একচাকা ঠেলাগাড়ি

পুরুষ দাশগুপ্ত

ঐ কামানের মুখ থেকে তুষারপাত । আমাদের মাথার মধ্যে ছিল নরক ।
একই মুহূর্তে আমাদের আঙুলের ডগায় বসন্তকাল । পুনরুন্মোদিত পদরেখা,
অমূল্য পৃথিবী, উজ্জ্বলিত তৃণদল ।

সব কিছুই মত অসম্ভবও কৈপে উঠল ।

ঈগল ভবিষ্যতের গর্তে ।

আম্মার অজ্ঞাতেই যে তাকে প্রবর্তনা দেয় এমন প্রতিটি কর্মের উপসংহাৰ
হিসেবে থাকে কোন এক অতৃপ্ত কি বেদনা । তাকে মেনে নিতে হবে ।

কি করে আমাব কাছে লগা এলো ? শীতে, আমার জানলাব কাছে
একটি পালকের মতো । অমনি ধবেব অগ্নিকুণ্ডে বেবে যায় জলন্ত কাঠগুলোব
লড়াই, যা, এখন পর্যন্ত, সাঙ্গ হয় নি ।

আমাদের অভিনিবেশে সাড়ি দেওয়া বিদ্যুচ্চমকের উল্লাস, সহবের মধ্যে
বসিয়ে দেওয়া, শুধু আমাদেরই পায়ে পায়ে চিহ্নিত পথ নিয়ে আটপোরে
চাউনিব কোমল সংবগুলি ।

যা আমরা আগে থেকে ভাবি নি, যা আমরা স্পষ্ট কবি ন, একান্ত নিজস্ব
পদ্ধতিতে যা আমাদের হৃদয়েব সঙ্গে আলাপ কববে এমন কিছু একটা ঘটলে
আমাদের ভেতরে সবকিছুই কেবল এক আনন্দময় উৎসবের অবশ্যস্বার্থী পবিত্রি
লাভ কববে ।

এসো গভীরতা মাপাব রজ্জু ফেলে যাই, শব্দের সংহতিতে একই পর্দায় কথা
বলে চলি, শেষ পর্যন্ত আমরা শুদ্ধ করে দেবো ঐ কুকুরগুলিকে, এমন করতে
পারবো যাতে আমাদের দিকে ঘোঁরাটে এক-চোখের দৃষ্টি রেখে তারা ভূপৃষ্ঠমি
সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে, যখন হাওয়া মুছে দেবে তাদের পিঠ ।

বিদ্যুচ্চমক আমাব মধ্যে অব্যাহত ।

শুধু রয়েছে আমার সধর্মী সঙ্গিনী বা সঙ্গী, যে আমায় জড়তা থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে, করতে পারে কবিতার উন্মোচন, আমায় ছোটোতে পারে পুরনো মরুভূমির সীমারেখাগুলির বিকল্পে, যাতে আমি সেগুলি জয় করতে পারি। আর কেউ নয়। স্বর্গ কিংবা বিশেষ অধিকার পাওয়া মর্ত্য, অথবা আলোডনকারী কিছুও নয়।

মশাল, আমি আমার সধর্মী ছাড়া আব কাব্যে সঙ্গে নাচি না।

জগৎ আর নিজের সম্পর্কে একটুখানি আস্থি ছাড়া, প্রথম শব্দগুলি সম্পর্কে একটুকরো অজ্ঞতা ছাড়া কোন কবিতা সুরু করা যায় না।

কবিতায়, প্রতিটি কি প্রায় প্রতিটি শব্দকে তার আদি অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কোনটি হয়ে ওঠে বহুযোজী। কোন কোনটি শ্বতিভ্রষ্ট। প্রসাবিত অনন্ত হীরক-পাণ্ডের মণ্ডলী।

কবিতা আমার কাছে থেকে আমার মৃত্যুকে ছিনিয়ে নেবে।

কেনইবা বিচূর্ণ কবিতা? কাব্য দেশের অভিমুখে যাত্রার শেষে জন্মপূর্ব অন্ধকার আর পার্থিব কঠোরতার পর্ব, কবিতাব সমাপ্তিই আলোক, জীবনের কাছে জীবের অবদান।

কবি যা আবিষ্কার কবে তাকে সে নিজের আধিক্যে বেগে দেখে না, লিপিবদ্ধ কবে তাকে অবিলম্বে হারিয়ে ফেলে। ওরই মধ্যে নিহিত থাকে তার নতুনত্ব, তার অস্বহীনতা আব তার সংকট।

স্বচীমুখ আমার বৃত্তি।

জন্ম হয় মাহুকের সঙ্গে, দেবতাদের মধ্যে ঘটে সাক্ষ্যহীন মৃত্যু।

যে মাটি বীজ ধারণ করে তা বিমর্ষ। এত যার বিপদের সম্ভাবনা সেই বীজ উৎফুল্ল।

এমন এক অভিষাপ যার কোন তুলনা মেলে না। এক ধরনের আলস্ত

সে চোখ পিটপিট করে, মনোরম তার স্বভাব, মুখভঙ্গি আশাপ্রদ। অথচ ভানটা কেটে গেলে, কী যে উদ্দীপনা, লক্ষ্যের অভিযুগে কী যে অব্যবহিত গতি। যে ছায়ায় সে ভারা বাঁধে তা অন্তর্ভুক্ত, একান্ত গোপন প্রবেশ, তাই হয়ত কোন এক আহ্বান থেকে সে অব্যাহতি পাবে, নিত্যই সরে পড়বে স্বাভাবিকতায়। কয়েকজন দ্রষ্টার আকাশের অবশেষের মধ্যে যথেষ্ট ভীতিপ্রদ কিছু অধিবৃত্ত সে রচনা করে।

নিষ্পন্দ গ্রন্থবাজি। অথচ যেসব গ্রন্থ আমাদের দিনগুলির অভ্যন্তরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে, সেখানে আত্মনাদ কবে ওঠে, শ্রবণ করে নৃত্যোৎসব।

কি করে ব্যক্ত কব। যায় আমাব স্বাধীনতা, আমাব বিশ্বব্যবহা, হাজাব বাকের শেষে : সেখানে নেই কোন ভিত্তি, নেই কোন ছাদ।

বাবংবার একটি অশ্রাবকেব, দূরবর্তী কোন এক শিশুর ছায়ামূর্তি শুণ্ডচবের মত আমাব কপালের দিকে এগিয়ে আসে আর লাক্ষ্যে ভিড়ায় আমাব দৃষ্টিস্থাব বাগ। তখন গাছেব তলায় বর্ণ। আবার কথা বলতে থাকে।

যে নাবীবা আমাদেব ভালবাসে তাদেব ঔৎসুক্যের কাছে আমরা অপবিচিত্র থাকতে চাই। আমরা তাদেব ভালোবাসি।

আলোব একটি বয়স আছে। অন্ধকারেব তা নেই। তবে কখন ছিল এই অগণ্ড উৎসেব লগ ?

ঝুলন্ত আব যেনবা তুবারে ঢাকা কয়েকটি যুত্থ চাই না। মজবুত একটি হলেই হোল। আব পুনরুত্থানহীন।

পিছু হটার উপায় এতটুকু বা একেবারেই না থাক। সবেয যারা নিজেদের সঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এসে আমরা সেইসব প্রাণীর কাছে দাড়াই। প্রতীক্ষা ওদের গ্রেতবে ভেতরে এক মাথাঘোরানো অনিত্রা খুঁড়তে থাকে। সৌন্দর্য ওদের পরিয়ে দেয় এক ফুলের টুপি।

পাখিরা, তোমরা যারা তোমাদের তণিমা, তোমাদের বিপজ্জনক সুরঙ্গি
সম্পর্ক কর এক শরবনে, শীতের প্রাচুভাবে আমবা কেমন তোমাদের মত হয়ে
যাই।

আমি ভালোবাসি যেসব হাত ভরে ওঠে, আর, যুগনক হওয়ার জন্ত,
মিলিত হওয়ার জন্ত যে আঁচুল অক্ষকে প্রত্যাহ্বান কবে।

বারবার আমার মনে হয় যে, আমাদের অস্তিত্বের প্রবাহকে ধারণ করা
দুঃসাধ্য, যদিও শুধুমাত্র তাব পেয়ালী ক্ষমতাব ফলভাগী আমবা নই, তবু হাত
আর পায়ের ধন্যবাস পতি আমাদের নিয়ে যেতে পাববে সেই আকাঙ্ক্ষিত
তটভূমিতে, যেখানে যেতে আমাদের ভালো লাগবে, বহুতর প্রণয়ের সন্নিধানে,
যাদের বিভিন্নতা আমাদের সমৃদ্ধ করে তুলবে, এই গতি অসমাপ্ত থেকে যায়,
দ্রুত অবসিত হয় চিত্রাকারে, আমাদের চিন্তাব প্রব সুরঙ্গির একটি বড়ির
মত।

আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষা জানে, পায়ে পায়ে বেয়ে যে এসে যাবা আমাদের
দীপ্তিময় কবে তোলে সে সব অলক্ষ্য শৃঙ্খল, অলক্ষ্য অগ্নিশিখার যথার্থ সংমিশ্রণ
কিছু স্বাধিকার ছাড়া আমাদের অধিকার থেকে আঁব কিছুই আমবা পাই না।

সৌন্দর্য একাকী তাব মহিমাম্বিত গথ্যা বচনা কবে, অদৃষ্টভাবে তাব খ্যাতি
গড়ে তোলে মানুষের মধ্যে, তাদেরই পাশে অগচ একান্তে।

এসো আমাদের অন্তরেব স্বতন্ত্রতার ধাবে, পাখাড়ে পাখাড়ে বপন করি
শববন, গড়ে তুলি আঁচুল খেত। নিষ্ঠুর আঁচুল, সতর্ক হাত, এই রক্তময়
ক্ষেত্রই হলো উপযুক্ত।

আধিকার যে করে তার বিপবীতে যে উদ্ভাবন কবে এক লৌহমণ্ড,
মাঝামাঝি কিছু একটা, কতিপয় মুগোস ছাড়া আর কিছুই সে বস্তুতালিকার
যোগ করে না, আর কিছুই এনে দেয় না প্রাণীদের কাছে।

অবশেষে সমগ্র জীবন, যখন তোমার গভীরে ভালোবাসার সত্য থেকে
ছিনিয়ে নিই মাথুর্ষ।

যেঘের কাছাকাছি থাকো। সজাগ থাকো যন্ত্রের কাছে। প্রতিটি বীজ
স্থগিত।

মানুষের হিতকারিতা কোন কোন তীরে ভোর। প্রলাপী হাওয়ার জটলায়,
আমি উদ্‌গতি, বন্দী করি নিজেকে, অভুক্ত কীট, অমুহুত এবং অমুসারী।

কঠিন আকৃতি, ঐ জলরাশির মুখোমুখি, যে পথ ধবে চলে যায় ফেটে
পড়া তোড়ায় সবুজ পর্বতের তাবৎ ফুল, গ্রহরগুলি দেবতাদের পরিণয়-বন্ধনে
আবদ্ধ হয়।

সতেজ হৃদ, আমি যার তল্লরী

২

শুক্ল দামকুণ্ড



লেওপল্ড সেদার সঁগরের কবিতা
POETRY OF LEOPOLD SEDAR SENGHOR

লেওপল্‌দ সেদার স'গর

সিন-এর রাত্রি

বধু, আমার কপালের ওপর রাখো তোমার বেদনা দূব করা হাত, পশমের চেয়ে
কোমল তোমাব হাত ।

ওপরে আন্দোলিত ভালগাছগুলি বাতের প্রবল মলয় বাতাসে যারা মর্মর ধ্বনি
তুলছে

কচিং । খাইমা-দেব গান পযন্ত নেই ।

ছন্দোময় স্তব্ধতা আমাদের দোলা দিক ।

এসো তাব গীত শুনি, এসো শুনি আমাদের নিবিড় রক্তের স্পন্দন,
এসো শুনি

হারিয়ে যাওয়া গ্রামগুলির কুয়াশাব ভেতব আফ্রিকার নাড়ীর
গভীর স্পন্দন ।

ঐ যে নিখর সমুদ্রের শয্যায় চলে পড়ছে শ্রান্ত চাঁদ

ঐ যে ঝিমিয়ে পড়ছে ফেটে পড়া হাসি, কণকবা নিজের

তুলছে মায়েব পিঠে বাচ্চাব মত

ঐ যে নাচিবেদেব পা ভারী হয়ে আসছে, ভারী হয়ে আসছে চাপান উত্বান
গাওয়া ছুই দল গায়কের জিভ ।

এইতো সময় নক্ষত্রের আর রাত্রি, যে রাত্রি ভাবছে

কল্পিয়ে ঠেস দিয়ে আছে ঐ মেঘেব পাহাড়ে, পবনে ছুধসাকা দীর্ঘ কটিবাস,
কুঁড়েরগুলির চাল কোমল আলোর চিক্‌চিক্‌ কবছে, কি এমন গোপনীয় কথা

ওরা বলছে, তারাদের ?

ভেতরে ঝাঁঝালো আর মন্দির গন্ধের অস্তরঙ্গতার মধ্যে ধরের অয়িকুণ্ড নিতে
যায় ।

বধু, জালিয়ে দাও ঘিয়ের প্রদীপ, পিতৃপুরুষেরা কথা বলুক, বাচ্চারা শুয়ে
পড়লে বাবা-মা যেমন বলে ।

একো এলিসার প্রাচীনদেব কর্ণধর শুনি । নির্বাসিত আমাদের মতো
ওরা মরতে চায় নি, চায় নি ওদের বীর্ষের খরশ্রোত বালুকার মধ্যে পথ
হাবিয়ে কেলুক ।

যেন আমি কান পাতি, ধোঁয়ায় ভরা কুঁড়েঘরের তেতর ঘেপানে শুভ আত্মাদের
ছায়ার আনাগোনা

তোমার উষ্ণ স্তনের ওপর আমার মাথা আশুন থেকে বের হওয়া আর ধোঁয়া
বেরোতে থাকা একটা দৃষ্টি-এব মতো

আমি যেন আমাদের মৃতদের গন্ধ নিশ্বাসে টেনে নিতে পারি যেন তাদের
জীবন্ত কর্ণধর সংগ্রহ করতে আব পুনরায় আবৃত্তি করতে পারি,
যেন ডুবুরিকে ছাড়িয়ে ঘুমের দূব অতলে নেমে যাওয়ার আগে, বাঁচতে শিগি ।

পুষ্প দাশগুপ্ত

কৃষ্ণা নারী

নয় নারী, কৃষ্ণা নারী

সেজেছ তোমার জীবন্ত পায়ের বন্ডে, তোমার দেহ-প্রতিমার সৌন্দর্যে !

তোমার ছায়ায় আমি বেড়ে উঠেছি, তোমার হাতের কোমলতা ঢেকে দিয়েছে
আমার চোখ

আর ত্যাগে গ্রীষ্মের আর মধ্যাহ্নের হৃদয়ে আমি তোমাকে খুঁজে পাই,

প্রত্যাশার স্বপ্নভূমি, ওপর থেকে আবে। ওপরে তাপদগ্ধ গ্রীবা

এবং তোমার সৌন্দর্য আমার হৃদয়ে নিয়ে আসে বজ্রের দাহন, যেন

ঈগলেব বিদ্যুৎচমক ।

নয় নারী, ছায়াছন্ন নারী

নিটোল শাস ভর্তি পাকা ফল, কালো মদের তামস উল্লাস, মুখ বা আমার
মুখকে গীতিময় করে তোলে

তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর অকলংক যার দিগন্তগুলি, তৃণভূমি কেঁপে ওঠে পূবালী
বাতাসের উষ্ণ আলিঙ্গনে

খোদিত টমটম, টানটান টমটম গমগম করে ওঠে বিজয়ীর হাতের আঙুলে

নয় নারী, ছায়াছন্ন নারী

তেল—কোন ফুৎকারে যা কুঞ্চিত হয় না স্থির তেল—মল্লের বক্ষে,

মালি-রাজপুত্রের বক্ষে

আকাশী দড়িতে বাঁধা পড়া হরিণ, তোমার স্বকের ভঙ্গায়

মুক্কাগুলি নক্ষত্র

আশ্বার আনন্দের তৃপ্তি, রক্তাভ সোনার প্রতিবিম্ব তোমার ডকে ঢেউ

থেলে যায়

তোমার কেশপাশের ছায়ায়, আমার উদ্বেগ বলসে ওঠে তোমার চোখের

আগামী সূর্যগুলির কাছে ।

নয় নারী কৃষ্ণ নারী

জীবনের শিকড়গুলিকে পুষ্ট কবার জন্য হিংস্রকে অদৃষ্ট তোমাকে ছাই করে

দেবার আগে

তোমার অস্থির সৌন্দর্যের আমি গান গাই চিবন্তনতায় প্রতিধ্বনি করি

তোমার দেহপ্রতিমা ।

মধুসূদন দাসগুপ্ত

নবীন সূর্যের অভিবাदन

নবীন সূর্যের অভিবাदन

আমার বিছানার উপরে, তোমাব চিঠির আলো

প্রভাতের ছড়িয়ে পড়া সব শব্দ

শ্রামাপাথির তীক্ষ্ণ ডাক, গনলেকের ঘণ্টাগুলি

ঘাসের উপরে, আশ্চর্য শিশিরবিন্দুর উপরে তোমার হাসি ।

নিষ্পাপ আলোর, হাজার হাজার গন্ধাকড়ি
পতঙ্গগুলি, যেন কালো ডানা বিশাল সোনালি মৌমাছি
আর যেন লাবণ্য ও কমনীয়তার বাকগুলিতে হেলিকপ্টার
প্রসন্ন সমুদ্রবেলায়, সোনালি আর কালো ঝাউগাছগুলি
আমি আবৃত্তি করি মালি-রাজকন্যাদের নাচের সংগীত ।

ছাখো আমি তোমার খোঁজে, বনবিড়ালের পায়ে পায়ে ।
তোমার সুগন্ধ চিরদিন তোমারই সুগন্ধ, গুঞ্জবণময় বনে বাদাড়ে
উদ্ধত লাইলাকের গন্ধের চেয়ে তীব্র ।
তোমার মদিব বন্ধ আমাকে পথ দেখাখ, আফ্রিকাব তৈরি তোমাব সুবতি
যখন আমার বাথালিয়া পাবেব তলায় আমি মাড়িয়ে চলি বুনো পুদিনা ।
পরীক্ষা আর সময়ের অন্তে, গহববেব তলায়
হায় ভগবান ! তোমাকে যেন ফিবে পাই, ফিরে পাই তোমার কণ্ঠ
তোমার কম্পিত আলোর স্রবাস ।

